একটা-কিছু।

শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এ।

মূল্য একটাকা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ

৭নং সোয়ালো লেন

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগজীবন ঘোষ

কাত্যায়নী প্রেস্

১৮।১ ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

উৎসর্গ

—:*:—

পণ্ডিত প্রবর, বিজ্ঞদার্শনিক, বেদের আচার্য্য

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাবারিধি, বি-এ, (ক্যাণ্টাব)

শ্রীচরণকমলেষু—

মহাত্মন,

সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক আপনি, দেশের ও দশের পূজনীয়, সুধাসমাজে প্রশংসিত ও আদৃত; কাজেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি আজ আপনার গুণগানে ব্যস্ত হইনাই এবং সে প্রয়োজনও নাই, এ কথাটা আপনিও যেমন জানেন, সাধারণেও সেইরূপ জানে।

নবীন ও তরুণ-লেখকের 'খেয়াল' নামক প্রথম পুস্তকখানি সহৃদয়তা সহিত এবং শ্রদ্ধার চক্ষে

আপনি পাঠ ক'রে সত্য সত্যই আমাকে বিশেষ উৎসাহিত ও সম্মানিত করেছেন, তাই কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ এ প্রাণ প্রকাশ্যভাবে ঋণ স্বীকার করে স্বতঃই আনন্দেমেতে উঠ্‌ছে। মত্তহৃদয়ের তাড়নার আকুলিত হাত দুখানিও তাই বুঝি কুসুম সংগ্রহ ক'রে আপনারই শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত। আজ আপনি উদার ও হৃদয়বান সুতরাং এ ভক্তি অঞ্জলি আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।

উপাসক অঞ্জলি দিয়ে নিজের জীবন আর সযত্ন সংগৃহীত এই পুষ্পনিচয়ও আপনার শ্রীচরণে বিরাজিত থেকে তাদেরও উদ্গাম সার্থক মনে করুক। আশীর্ব্বাদ করুন যেন দীনের সাধনা বিফল না হয়। ইতি।

লাভপুর, ১৫ই মাঘ ১৩২৭। বীরভূম।

ইতি বিনয়াবনত—
কালীকিঙ্কর।

লেখকের নিবেদন।

পুস্তক সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করবার আগেই তাঁকে একবার ভক্তিভরে প্রণাম করছি যাঁর কৃপায় এই দ্বিতীয় গল্প পুস্তক লোক সমক্ষে বের করবার সুযোগ হলো। কাগজের অভাবে ও ছাপাখানার দৌরাত্ম্যে এবং থিয়েটারের খোস খেয়ালের জন্য আমার ঐতিহাসিক নাটক "মোগল বাদসা" প্রকাশিত হয়েও হচ্ছেনা তজ্জন্য ত্রুটী স্বীকার করছি।

"একটাকিছু"র গল্পগুলি বাঙ্গালা-সাহিত্য-উন্নতি-কল্পে লিখিত হয়েছে, একথা বলবার দুঃসাহস আমার নাই; তবে আমার 'খেয়াল' নামক গল্পের পুস্তক পাঠ ক'রে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তিগণ ও বন্ধুবর্গ আমায় অনুগৃহীত করেছেন, তাঁদেরই আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য আজ এই পুস্তক ছাপার অক্ষরে বাজারে নাম্‌লো। এই ভেবে সাধারণে আমার সকল দোষ মার্জ্জনা করলে আমি বিশেষ সুখী হ'ব।

আমার বন্ধুদের মধ্যে দুই একজন গল্পের পুস্তকে কোনরূপ প্রসঙ্গ আলোচনা উচিত মনে করেন না, এবং

আমিও নিজে বুঝি, কোন একটা সমালোচনা লিখছি তাতেও স্বীকার করেছি যে, গল্পের মধ্যে মনস্তত্ব কিংবা সমাজতত্ব ইত্যাদির সমধিক ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা গল্পের সরসতা নষ্ট করে, কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে গল্প লিখে কেউ যে আর বাঙ্গলা ভাষার কদর বাড়িয়ে দেবেন কিংবা বাঙ্গলা—সাহিত্য পরিপুষ্ট করিবেন, তার উপায়টী সুপ্রসিদ্ধ গল্প লেখকেরদল রাখেন নাই, পক্ষান্তরে গল্প বলে আরব্যও পারস্য উপন্যাসের দর নামিয়ে দেবেন তারও উপায় নাই, এমত অবস্থায় আমার মনে হয় যে, গল্প বলবার মাঝে মাঝে বেশ সহজ সরলভাবে মিষ্ট কথায় বুঝাবার উপায় রেখে সমাজেরপ্রতি মনুষ্য চরিত্রেরপ্রতি আদব কায়দা, নিয়মকানুন ও চাল চলনেরপ্রতি সময়োচিত কটাক্ষপাত বিশেষ উচিত। দশটা কল্পনার মাঝে একটা সত্যের অবতারণা অবশ্য বোধগম্য ভাষায় নিতান্ত আবশ্যক। আর সেই আবশ্যক বোধে মামুলি সাজ সরঞ্জাম, আয়োজন উপকরণও আবশ্যক অনাবশ্যক যদি পরিহার করতে হয় আমার মতে তাও করা একান্ত প্রয়োজন, গল্পের

বই প'ড়েও যদি কেউ নষ্টমুখী স্রোত ফিরাতে পারে অন্ততঃপক্ষে ফেরবার ইচ্ছাও করে, তাহলেই যথেষ্ট হোল। আর কাতুকুতু দিয়ে হাসান, কিংবা ধ'রে পাশ ফিরিয়ে শোয়ান, ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে, চমৎকৃত করে দেওয়া ইত্যাদি গতানুগতিক যা চলে আসছে, তার জন্য নূতন প্রয়াস নূতন লেখককে না ক'রলেও চলবে। এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হ'য়ে স্থানে স্থানে যে সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, যদি সে গুলির নিজের সরসতা নষ্ট না ক'রে থাকি তা হ'লে চিরপ্রচলিত প্রথা না মেনে যে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হ'য়েছি তা বলতে পারি না এবং অন্যে যদি কেউ কিছু বলেন, তবে তিনিই যে ন্যায় কথা বলছেন তাও স্বীকার করে নিতে পারি না। আজ কালকার সমালোচনার মূল্য কত তা আমি জানি—কোন স্থানে পুস্তক পাঠ না ক'রেই দুই, তিন পাতা সমালোচনা লিখিত হয়, স্থল বিশেষেও কলা মূলো আম সন্দেশ দিয়ে 'সমালোচনা বের করান হয় অধিকাংশ স্থলেই সমালোচক নিজের

কিংবা সাম্প্রদায়িক মতের সহিত অমিল দেখলেই নানারূপ কদর্য্য সমালোচনা করেন, এবং লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে অন্যায় অধিকার নিয়ে বসেন; অর্থাৎ লেখকেরই সমালোচনা করেন, কাজেই এমত অবস্থায় মনে মনে যেটা বুঝছি ন্যায়, পেশাদার সমালোচকদের খাতিরে সেটাকে তো অন্যায় বলতে পারি না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের মেরুদণ্ড ভাষা ও ভাব, সেই দুটি স্বর্গীয় বস্তুর সম্ভ্রম কতদূর রক্ষা করতে পেরেছি জানি না তবে সাধ্যাতীত চেষ্টার ত্রুটী ত কেউ করে না; বলা বাহুল্য আমিও করি নাই। এখন প্রকৃত সুধীজন যাঁরা, তাঁদের উপর সে বিচারের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। গল্প গুলি পড়ে, বন্ধুবর্গ আপনারা কেমন অনুভব ও উপভোগ করেন জানালে বিশেষ বাধিত হ'ব। ইতি

লাভপুর ১২ই মাঘ ১৩২৭ } বিনীত
বীরভূম। } শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

পুঃ নিঃ—কোন বিশেষ গল্পের নামানুযায়ী পুস্তকের নাম দেওয়াটা লোক ঠকাবার ফন্দী মনে ক'রে প্রচলিত প্রথার অনুসরণে বিরত হ'য়েছি ; এ ত্রুটিও মার্জ্জনীয়।

গ্রন্থকার

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

সেদিন সকাল বেলায় ব্যায়ামাদি সমাপনান্তে ছাদ হ'তে নেমে এসে সবে মাত্র উপরের ড্রয়িংরুমে বসেছি এমন সময় পাশের ঘর হ'তে বাবার কণ্ঠস্বর আমার কাণে এল। তিনি বলছেন "ওগো, যাওনা সুহাসকে একবার মেয়েটি দেখাও। মেয়ের মামা কত কষ্ট করে কোন্ সুদূর দেশ হ'তে মেয়েটিকে এনেছে, শুধু তোমার কথায়। যাও নন্দদুলালকে একবার দেখিয়ে দাও, পছন্দ হয় ভালই।" কথাগুলো শুনে ও শুনলুম না কারণ মেয়ে অপছন্দ করা যেমন আমার একটা উৎকট রোগে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দেশ বিদেশ হ'তে হরেক রকমের মেয়ে আমদানী করে আমার বিয়ে দেওয়াটা মায়ের একটা বিষম hobbyতে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই উৎকণ্ঠিত কিম্বা বিচলিত না হয়েই টেবিলের উপর আমার লিখিত 'ব্যায়াম ও যোগ' নামক পুস্তক খানটা নাড়া চাড়া করে নিজের পাণ্ডিত্যের কথা ভাবতেলাগলুম। বড় বড় কাগজের প্রশংসার ধ্বনি তখনও আমার কাণে বাজছিল তাই অন্যদিকে কাণ কিম্বা মন দিবার সুবিধা মোটেই হোল না। মনে মনে বড় স্ফূর্ত্তি অনুভব করছিলুম কেন না ব্যায়াম ও যোগের নিকট সম্বন্ধটা কি বিশদভাবে সহজ সরল কথায় বিশ্লেষণ ক'রতে সমর্থ হয়েছি আর লোকে কেমন

আমার কথাগুলিকে বেদবাক্য মনে করে মহা খুসী হয়েছে—দৃশ্যটা আমার মানস নয়নে প্রতিভাত হয়ে প্রভাতের মন্দ মধুর বাতাসের মত আমার মনকে উল্লাস হিল্লোলে নৃত্য করবার অবকাশ দিয়েছিল। সুখ সাগরে সুখ সন্তরণে ব্যস্ত এমন সময় মনে হোল বইখানটার একটা ইংরাজি তর্জ্জমা করে বিলাতে পাঠিয়ে একটা জবর দরের নাম কিনবো, অমর হয়ে যাব, আমার বিদ্যায় না কুলায় তো দাদার সাহায্য-নেব-এমনি কত কি কল্পনা করছি এমন সময় মা এসে স্রোতমুখে বাধা দিলেন। মায়ের স্নেহের সুর কাণে পৌছাতেই বুঝলুম যে এ মেয়ে দেখবার তাগিদ। ফলেও হোল ঠিক তাই। মায়ের অনুরোধে আমি মেয়ে দেখতে উঠে গেলুম। ২।১টি ঘর অতিক্রান্ত হয়ে একটি ঘর দেখিয়ে মা বললেন "লক্ষ্মী বাবা আমার, ঘরের মধ্যে যাও, মেয়ের মামা ঐ ঘরে আছেন; তুমি গেলেই উনি বাইরে আসবেন, আর বড় বৌমা পাশের ঘর হ'তে এসে মেয়েটিকে দেখিয়ে দেবে।" আমি বললুম "মা, এ আয়োজন তোমার না বাবার? এমন সুচারু বন্দোবস্ত যে তুমি করতে পারবে তা তো আমার মনে হয় না। হয় আইনজ্ঞ পিতার না হয় দাদার প্রোগ্রাম এটা।" "সে পরে জানবে সুহাস, এখন একবার ঐ ঘরে যাওতো বাবা।" মা অদৃশ্য হলেন আমিও মায়ের মনস্তুষ্টির জন্যে ঘরে প্রবেশ করলুম। প্রবেশ করতেই দেখলুম একখানি চেয়ারে একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া (অবশ্য আন্দাজের কথা)

সুসজ্জিতা বালিকা অপর একটিতে মধ্য বয়সী ভদ্রলোক। বুঝলুম ইনিই মেয়েটির মাতুল। বেশ সুন্দর নিটোল চেহারা—হয় যোগ কিম্বা ব্যায়ামে সুঅভ্যস্ত। 'ব্যায়াম ও যোগের' দ্বিতীয় সংস্করণে প্রয়োজন হ'তে পারে ভেবে বালিকার পানে লক্ষ্য না করে ভদ্র-লোকটিকেই বেশ ভালরূপে দেখতে লাগলুম। তথ্য সংগ্রহ করবার মানসে কিছু জিজ্ঞাসা করব ভাবছি এমন সময়ে 'এস বাবাজি' বলে ভদ্রলোক চেয়ার পরিত্যাগ করে উঠেই বাইরে এলেন আর অমনি পট পরিবর্ত্তন হয়ে বৌদিদি আবির্ভূতা হ'লেন। অনেকটা ইন্দ্রজালের মত ঠেক্‌লো; কিন্তু মায়ের নিকট উদ্যোগ পর্ব্ব প্রণালীটা শুনে-ছিলুম ব'লে আর কিছু বললুম না। বৌদিদি হাসতে হাসতেই বললেন "কি ঠাকুরপো, এইবার কেমন করে অপছন্দ কর একবার দেখছি। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ মান না কেমন একবার তাই দেখি।" "বৌদি, প্রজাপতি ফড়িং নিয়ে তোমরাই থাক—" "আর মশায় কি ডাম্‌বেল্ নিয়েই থাকবেন ভেবেছেন? যাক ভাবনা চিন্তা চুলোয় দিয়ে একবার চোখ দুটো নিয়ে দেখ ঠাকুর-পো কি জিনিষ আম-দানী করেছি। আমি মেয়ে মানুষ না হয়ে পুরুষ হ'লে কি তোমায় এ রত্নের সন্ধান দিতুম না এ ঘরের কানাচে তোমার মত অবিবাহিত যুবককে আসতে দিতুম?" এই বলেই বালিকার কাছে গিয়ে বৌদিদি তার হাত দিয়ে বালিকার আনত মুখ উন্নত করে ধরেই বল'লে "দেখ ঠাকুর-পো, ব্যায়াম ও যোগের অপমান হ'বে না

ভাল করে দেখ।" আমি ভাল করেই দেখলুম আর সত্যের খাতিরে বলা উচিৎ যে সে মুখে দেখবার মত অনেক জিনিষই ছিল এবং কোনটি যে, আমার কবির চোখ না হ'লেও, বাদ গেল তা বলতে পারি না। ভাব নিবদ্ধ চোখ দুটি সংযত করে দেখছিলুম মনও বসছিল না কিন্তু চোখ ও ফেরাতে পারছিলুম না। আমার ভাব দেখেই প্রখর বুদ্ধি সম্পন্না বৌদিদি বললে "কেমন ঠাকুর-পো, এইবার জব্দ হয়েছ তো? মেয়ের ঘার ধরে গেল তবু তোমার দেখা ফুরুলো না।" "কি বল বৌদি?" কথাটা জোর করেই উপেক্ষার স্বরে বললুম। "বুঝেছি ভাই বুঝেছি, শুধু এই ভাবছো তো যে ব্যায়াম ও যোগের ব্যাঘাত ঘটবে কি না, কিন্তু ঠাকুর-পো আমি বলে রাখছি যে তোমার ব্যায়াম ও যোগ এইবারে সফল হ'বে। স্বয়ং মহাদেব টলে' যাবেন ঠাকুর-পো, তুমি তো ছার্।" মায়ের আদর আমায় একটি মস্ত অভিমানী করে তুলেছিল, আজ সেই অভিমানে ঘা পড়ে দেখে' বৌদিদির তামাসা আমার আদৌ পছন্দ হোল না তাই একটু কর্কশভাবেই বল্লুম "বৌদিদি মহাদেব যেখানে খুসী ঢলে' পড়ুন আমার দুঃখ নাই কিন্তু আমি তা পারবো না পারছিও না।" তারপর স্বরটা একটু স্বাবাবিক করেই বলুলম "ধন্য বৌদি তোমার চোখ্। তোমারই বা দোষ কি? তুমি তো মেয়ে মানুষ কাজেই কুৎসিতা হ'লেই বা মেয়ে মানুষকে ঠাট্টা করবে কেমন করে?" আমার এই শেষ কথাটা বুঝি সুন্দরী বালিকার

আত্মসম্মান কিম্বা আত্ম অভিমান জ্ঞানে—তখন বুঝবার তার বেশ শক্তি হয়েছিল—আঘাত দিলে তাই একবার মাত্র তার চোখ দুটি, মনে হোল দৃষ্টিটা একটু তীব্র, তার টানাটানা চোখ দুটি আমার উপর আবদ্ধ হয়েই পুনরায় আনত হোল। আমিও বুঝলুম বৌ-দিদিও বুঝলে যে বালিকা নিখুঁত সুন্দরী হয়েও কুৎসিৎ আখ্যায় আখ্যায়িতা হ'তে শুনে একটু রাগান্বিত হয়েছে। অবশ্য হ'বারই কথা। যা'ক্ দেখা তো এই খানেই চুকে গেল। আমিও বীরদর্পে ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে আরাম কেদারায় একটু লম্বা হয়ে শুয়ে আশ্বস্ত হলুম।

এইস্থানে আমার একটু পরিচয় দিই। আমি শ্রীসুহাসচন্দ্র হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি স্যার অমিয়মাধব চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠ পুত্র এবং 'ব্যায়াম ও যোগে'র উচ্চ প্রশংসিত গ্রন্থকার। এটা বললুম তার কারণ আমার একটা advertisement এর কাজ হোল অথচ অন্যায় যে কিছু হোল তাও মনে হয় না। ইউ-নিভারসিটির সঙ্গে আমার বেশ সদ্ভাব ছিল না, সুবিধামত বনিবস্তা কথনও হয় নাই। চিরকাল ফুটবল, হকি, ক্রিকেট্ খেলা সুইমিং কমপিটিশানে (Swiming competition) এ যোগদান করা কুস্তী ও ডাম্‌বেল (Dumbell) ভাঁজা আমার লেখা পড়ায় বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করতো, আর সেই জন্যই মা বাবা, জ্যেষ্ঠ সহোদর এমন কি বৌদিদি পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে আমার

নিন্দাবাদ করতে ইতস্তত করতেন না। দুবার আই, এ ফেল হলুম এই অমার্জ্জনীয় অপরাধে বাবা আমায় বহু তিরস্কার করলেন, অমনি অভিমানী আমি অভিমানের ভরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠের উপর উঠেই তার দিকে তখনই পিছন ফিরলুম। আর সেই হ'তেই তার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কনিষ্ঠ আমি, মায়ের আদরের আমি তাই আমার এই খোসখেয়ালীতে পিতা আমার যথেষ্ট রুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু মায়ের খাতিরে বেশী কিছু উচ্চবাচ্য করেন নাই। তারপর হ'তে রীতিমত ব্যায়ামের অভ্যাসে আর মেজে ঘসে বেশ নধর চেহারা বানিয়েছিলুম। দাদা আমার চেয়েও সুন্দর ছিলেন কিন্তু ব্যায়ামাভাবে, তারপর ডি, এল, পরীক্ষার চাপে তাবপর এই সবের নিত্যসহচর dyspepsia এর কোপে তিনি একবারে রোগা পটকা মেরে গিয়েছিলেন। দাদা ডি, এল উপাধি নিয়ে Law college এর প্রিন্সিপাল (principal) হলেন আর কুস্তী করে আমি All India Exercise League এর অবৈতনিক্ সম্পাদক হলুম। দাদা উপার্জ্জন করতে লাগলেন আর আমি ব্যয় করতে লাগলুম এইজন্যই বাবা আমায় আদৌ পচ্ছন্দ করতেন না; কিন্তু মায়ের জন্য তেমন কিছু বলতেও পারতেন না।

পূর্ব্বোলিখিত কনে পচ্ছন্দ করবার অল্পদিন পরেই দেশে বাঙ্গালী পল্টন নেবার ধুম পড়ে গেল। সরকারের আহ্বানে যুব

কের দল বৃষ্টির দিনের উন্মত্ত পতঙ্গের মত দলে দলে সরকারের পতাকার নীচে জমায়েৎ হোল। দেখতে দেখতে Bengalee Regiment, Bengalee Battalion খাসা গড়ে উঠ্‌লো। আমি ও সময় বুঝে কনে পচ্ছন্দ করবার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ঐ একটা দলে যোগ দিলুম। মায়ের কাতরতা, পিতার নিষেধ দাদা ও বৌদির অনুরোধ কিছুই গ্রাহ্য করলুম না। আমি নাবালকের কোঠা উত্তীর্ণ হয়ে সাবালকের কোঠায় পা দিয়েছিলুম কাজেই হাকিম বাবা মায়ের কান্না বন্ধ করতে না পেরে রায় দিয়েছিলেন যে তিনিইতো অত্যাধিক আদর দিয়ে সুহাসের মাথা খেয়েছে, এখন আর কাঁদলে কি হ'বে। যাই হোক এখানে আমাদের সব স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়ে গেল—শিক্ষানবিশী হয়ে করাচীতে গেলুম। শিক্ষাও শেষ হোল; ফরাসী সীমান্ত প্রদেশে যাব সব ঠিক্‌ঠাক্। জাহাজ তৈয়ারী, সাজসরঞ্জাম সব প্রস্তুত, আমরাও উদগ্রীব, এমন সময় ডাক্তারের ডাক পরলো। শেষবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিতে ডাক্তারের কাছে এলুম। কি বিড়ম্বনা, আমার consumption এর tendency অনুভব করে আমায় discharge করলেন। মন ভেঙ্গে গেল, বড় হতাশ হয়ে পড়লুম। যে বুক এতদিন এতটুকু ব্যথা অনুভব করে নাই সেই বুকে—হায়রে আমার ব্যায়াম ও যোগ—এখন অসহ্য যাতনা অনুভব করতে লাগলুম। বাড়ী ফিরবো না ভাবছি এমন সময় আমার একজন দোসর মিললো।

আমার মত তারও heart weak না ঐ একটা কি রকম বলে discharge করেছে। কাজেই ইতনষ্ট স্তুতভ্রষ্ট আমরা দুজনে যুক্তি করে দেশ ভ্রমণে বেড় হলুম প্রথমেই একটানা পুনা সহরে এলুম। সেথানে যা কিছু দেখবার দেখে জয়পুর আসব ভেবে ষ্টেসনের বিশ্রামাগারে বসেছি এমন সময় একজন বাঙ্গালী বাবু সেথানে উপস্থিত হয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে ও হাব ভাব দেখে বাঙ্গালী অনুমান করে, কারণ তখনও আমাদের জাব্বা জোব্বী আঁটাই ছিল, আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ব্রাহ্ম জেনে জাতগোষ্ঠী গোত্র সব জানতে চাইলেন। যা জানতুম বল্লুম বলা বাহুল্য যা জানতুম না বলতেও পারলুম না। এত সব জিজ্ঞাসা করবার কারণ জানতে চাইলুম যখন তখন দেখি ভদ্রলোক তাঁর যজ্ঞোপবীত হাতে আমার পায়ের নীচে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ব্যাপার জানতে চাই কিন্তু ভদ্রলোক ভূমিকা পার হয়ে আখ্যান সমীপে আসতেই চান না। শুধু মুখে এক কথা "মশায় ব্রাহ্মণ আপনি, উচ্চবংশীয় আপনি, দয়া করে এই গরীব ব্রাহ্মণের প্রাণ তার জাত কুল রক্ষা করুন।" শেষে অনেক কষ্টে আমার সঙ্গী জাতিতে কায়স্থ হুগলী জেলার কোন পল্লীগ্রামে তার বাড়ী, সে কায়েতী চাল চেলে জানতে পারলে যে ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যার বিবাহ লগ্ন আজই রাত্রি আটটায়; সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ কিন্তু ভাগ্যদোষে স্থিরীকৃত ও বিদেশ হতে আনীত পাত্রটি সহসা কলেরা

-রোগে আক্রান্ত হয়ে এইমাত্র স্বর্গারোহন করেছেন। এমত অবস্থায় এই বাঙ্গালীহীন দেশে চাকুরীজীবী এই ভদ্রলোকের কন্যার পাণি-গ্রহণ করে তাঁর মান সম্ভ্রম, জাত যা কিছু, আমি চক্রবর্ত্তী পুত্র, আমায় রাখতেই হবে।

ভাবলুম এ বড় মন্দ নয়। কোথায় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাহায্যে গোলাগুলির মধ্যে বীরবপু নিয়ে যোদ্ধৃবেশে ঘুরে ফিরে জর্ম্মণ রাজ্য জয় করবো তা না পুনা সহরে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সম্ভ্রম রাখতে, বাঙ্গালী মেয়ের মিত্রতা লাভ করতে ষ্টেসনের বিশ্রামাগার হ'তে বরবেশে রাইফেলের (rifle) বদলে দর্পণ হাতে দিয়ে হেলমেটের (helmet) বদলে টোপর মাথায় দিয়ে ভেরী নিনাদের পরিবর্ত্তে শঙ্খ-নিনাদের মাঝে রমণী হৃদয় জয় করবো। বাঃ, আশ্চর্য্য বিধির বিধান। একটা কথা হঠাৎ মনে হোল। আমাদেরই কে এক-জন বলতো 'যে এঁটো পাতা কখনও স্বর্গে যায় না, যতই ঝড় হোক যতই cyclone হোক ঘুরতে ঘুরতে তাকে জোর বাঁশগাছের আগায় পরতে হ'বে।' আমারও হোল এ ঠিক্ তাই। কোথায় জর্ম্মণ রাজ্য, কোথায় পুনা সহর, কোথায় একটা বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জ্জন, কোথায় চিরপ্রচলিত বাঙ্গালীর এই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। এ আমার ঠিকই হয়েছে অনুপযুক্তের গর্ব্বিতের অভিমানীর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। ভদ্রলোকের কাতরতা সত্যই আমাকে টলিয়েছিল, তাই কনে দেখে পছন্দ করবার ইচ্ছাও আর মনে এল না।

তথাপি কি কর্ত্তব্য ভাবছি এমন সময় আমার সঙ্গী বললে "ওহে, ধরা চূড়া পরিত্যাগ করে মোহন সাজে সাজ। বিপন্নকে উদ্ধার করা ও হ'বে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাট্‌নী লিখে উপভোগ করবার সুবিধাও হ'বে।" "ভাই পেট ভরলে তবে তো চাট্‌না।" কে কি ভাবে কথাটা নেবে ভেবে কিছু বলি নাই তবে পাল্টা জবাব দিতে হয় তাই বল্‌লুম; কিন্তু দেখলুম ভদ্রলোক তখন বলতে সুরু করেছে মশায়, আমার পুত্র বলুন কন্যা বলুন যা কিছু বলুন সবে ঐ একটি! আজ ২১ বৎসর পরিশ্রম করে যা উপায় করেছি সব ঐ কন্যার। আপনি ধনী সন্তান, আপনার পেট ভরাতে পারি সে সাধ্য নাই, তবে শুধু নিবেদন আমার জাত কুল রক্ষা করুন।" আমি ভদ্রলোকের কথায় সত্য সত্যই বড় অপ্রতিভ হয়ে গেলুম। আমি বললুম এক ভেবে ইনি ধরলেন অন্য। কাজেই আমায় আবার 'পুনশ্চ' যোগ দিতে হোল। আমি বললুম "মশায়, আমি সে কথা বলি নাই, আমি শুধু—।" আমায় বাধা দিয়ে বন্ধুবর বললে "বেশ, বেশ, খুব হয়েছে, উঠ এখন। সাতটা বেজে গেছে। আটটার সময় লগ্ন জান তো? নাও বর সাজ, আমি বরকর্ত্তা সাজি নইলে আর উপায় কি? এ সবই একটা romance হয়ে গেল। অগত্যাপক্ষে, নাচারে পরে, ঘটনা বিপর্য্যয়ে আমাকে বরই সাজতে হোল। ছাঁদ্‌না তলায় বসবার কিছুক্ষণ পরেই কনে এল। নাপিত ধুরন্ধর তখনই চারচোখের মিলন করতে ব্যস্ত

হোল। চার চোখের মিলন হ'তেই দেখি—কি আশ্চর্য্য—কনে আমার পরিচিত। বৌদিদির প্রজাপতিব নির্ব্বন্ধটা তখনই আমার মনে পড়ে গেল। আমি বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে শুধু কনের মুখ পানেই চেয়ে রইলুম। মালা বদল করতে গিয়েই কনে আমায় দেখে নিলে—দেখলুম সেও যেন আমায় চিনেছে। শাঁক বেজে উঠলো ভোঁ ভোঁ। মাথার উপরের যবনিকা অপসৃত হতেই দেখলুম সম্মুখে সেই নিটোল চেহারার মাতুল। আমাকে দেখেই বলে উঠলো "বাবাজী, এ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।"

লাঞ্ছিতের অভিষেক।

নামটি আমার রামদাস কিন্তু ভাগ্য বলেই হোক্ আর বিশ্ব-শিল্পীর ভুলেই হোক্ চেহারাটা কিম্বা স্বভাবটা মোটেই রামদাসের মত ছিল না। বেশ মোলায়েম চেহারা, রংটি চাঁপার কলির মত, চুলগুলি কুঞ্চিত তার উপর হাসিটি ও ছিল মধুর। সঙ্গীরা দেখলেই বলতো 'ওই দেখ হে মিষ্টহাসি আসছে। অনেকেই বলতো ওহে তোমার হাসির ফটো প্যারিস এর এক্সিবিসনে (Exhibition) পাঠিয়ে দাও, একটা খুব বড় দরের প্রাইজ পাবে। বলা বাহুল্য সে চেষ্টা আমার দিক হ'তে কথনও করা হয় নাই। স্বভাবটা ও ছিল খুব নরম; কেন না লোকেই বলতো যে রামদাস বড় ভাল মানুষ, আবার কেউবা একটু ঘুরিয়ে বলতো রামদাস বড় 'মেদা'।

আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে। আমাদের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নগদ টাকা ও কিছু ধানের জমি। পাড়াগাঁয়ে বাস কাজেই এই সম্পত্তির আয় হ'তেই দুর্গোৎসব, কালীপূজা জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই সংসারের অন্যান্য খরচা চলে যেত। বাড়ীতে আমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর, মা ও বাবা। গ্রামেই একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, সেখানে বিশেষ অধ্যবসায় ও

ধৈর্য্যের সহিত উপর্য্যুপরি তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েও যখন কৃতকার্য্য হ'তে পারলুম না তখন মা ও বাবা এক সঙ্গে রায় দিলেন যে রামদাস বাবাজীবনের আর পড়বার প্রয়োজন নাই। যথেষ্ট হয়েছে। সে এখন সংসারের কাজ কর্ম্মে মন দিক্।' ফলে ও হোল তাই। শ্রীরামদাস রায় মা সরস্বতীর দরবার হতে জন্মের মত নিষ্ক্রান্ত হয়ে সংসারের কাজে মন দিলেন।

বাবা আমার কখনই অবিবেচক ছিলেন না তাই বিবেচনা করে যেমন পড়াশুনা বন্ধ করে দিলেন সেইরূপ বিবেচনা করে কিছুদিন হাঁফ ছাড়বার সময় ও দিলেন। দেশে বুদ্ধিমান বলে তাঁর যথেষ্ট পসারছিল; অনেক লোক অনেক সৎপরামর্শ নেবার জন্য তাঁর কাছে যাতায়তও করতো। এবার সেটা আমি ও মর্ম্মে মর্ম্মে পরখ্ করলুম। বেশ উঁচুদরের সংসারী হ'ব সংসারের কাজে বিশেষ মায়ামমতা বসবে বলে তিনি আমার বিয়ে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই একটি রাঙ্গা বৌ আমাদের ঘরে এল। মাষ্টারের টানা হেঁচরা হ'তে মুক্তিলাভ করলুম; কিন্তু শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী আমার স্কন্ধে ভর করে বসলেন। শিক্ষকদের টানাটানিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হয় নাই কিন্তু শ্রীমতির ভারে কাঁধ বেচারা একেবারে অনেক-খানি নেমে পড়লো—মনে হোল বুঝি বা ভেঙ্গেই পড়ে।

হাঁ, এইস্থানে আমার বিয়ের কাহিনীটা একটু বলা উচিৎ। নানাস্থান অতিক্রম করে বরবেশী আমি আত্মীয় বন্ধু সঙ্গে নিয়ে

চন্দনগরের আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ীতে উপস্থিত হলুম। তারপর তারপর যা হয়ে থাকে তাই হোল। সালাঙ্কারা শ্রীমতি লক্ষ্মী দেবীকে সাত পাকের বাঁধনে বেঁধে পাত্র মিত্র সমভিব্যহারে হাসতে হাসতেই বাড়ী ফিরে এলুম। বিয়ে করে আর কে না হাসে? তায় আবার আমার হাসিটা অনেকের কাছে লোভনীয় মধুর কাজেই আমি আমার বিয়েতে হাসবো এ আর বেশী কথা কি!

বর কনে বাড়ী এল, মাও পাড়ার আত্মীয়ারা বৌকে আদর করে ঘরে নিয়ে এলেন। ওমা, বাড়ীর মধ্যে এসেই বৌ এর মূর্চ্ছা। চারিদিকে দেখ্ দেখ্ রব উঠলো, একটা মহা হুলুস্থুল বেধে গেল। কেউবা জলের ঝাপ্টা দিতে কেউবা পাথার বাতাস করতে ব্যস্ত হোল। যাক্ কিছুক্ষণ পর নববধূ চক্ষুরুন্মীলন করে উঠে বসেই বললেন "মাগো, এ গোয়াল ঘরে আমায় নিয়ে এলে কেন? একি!", বাড়ী ঘরের লোক মনে করলে বুঝি লক্ষীদেবীর এখনও সম্পূর্ণ চৈতন্য আসে নাই; কিন্তু যখন তারা বুঝলে যে, না, এ মাটির দেওয়ালে বেড়া, বিচালীর ছাওনি করা ঘরে নগরবাসিনী সোহাগিনী থাকতে পারবে না তখন সকলেই—বুদ্ধিমান পিতাকে আর বুদ্ধিহীন পুত্রকে এক বাক্যে সমস্বরে টিট্কারী দিতে দিতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। অশিক্ষিত পুত্রকে বিয়ে দিয়ে শিক্ষিত করবার নীতি, সহরের সৌখীন ফুট্‌ফুটে বধূ আনবার ফল বাবা ও মা বেশ হাড়ে হাড়ে অনুভব করলেন। মা তো আমার কেঁদেই

আকুল হ'লেন। গ্রাম্য দেবদেবীর ষোড়শোপচারে পূজার মানসিক্ করে সন্তুষ্ট না হয়ে শেষে দূর, বহুদূর ও সুদূর দেশের ঠাকুর ঠাকরুন্ গুলির ও ঘুঁসের রীতিমত পদ্ধতিমত ব্যবস্থা করলেন কিন্তু হায়, ঘুসেব ছড়াছড়ি লক্ষ্মীদেবীর ব্যবহারের বহরের বাড়াবাড়ি করেই তুললে। শেষে নাচার হয়ে মা আমার সব হাল ছেড়ে দিয়ে আমায় বললেন "বাবা রামদাস, তুই শুধু চুপ করেই থাকতে; জানিস; কিন্তু আর তো তা ক'রলে চলবে না। দেশময় একটা কেলেঙ্কারি লোকের কাছে মুখ দেখান ভার। দেখ্ বাবা, একটু চেষ্টা করে দেখ্।" চুপ করে থাকাই আমার অভ্যাস তাই মৌনভাবেই দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে মনে বুঝলুম যে সত্য সত্যই এ একটা বিষম কেলেঙ্কারী। বুঝলুম কিন্তু উপায় কি! কত বুঝিয়েছি, লক্ষ্মীকে আমার বিদ্যার বুদ্ধির অন্তর্গত সমস্ত নজির তুলে দিয়েছি কিন্তু সেই এক কথা "ওগো, দুদিনের জন্য ও একবার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার চিরন্তন স্বভাব বদলিয়ে আসি।" এই রকম কত কথা সে বলেছে কিন্তু তাইতে আমার প্রতি অভক্তির আভাষ কোনদিন ও ফুটে উঠে নাই। আমি উভয় সঙ্কটে পড়লুম। মা বাবা কিছুতেই বুঝবেন না স্ত্রী ও কিছুতেই বুঝবেনা। গ্রামের ধর্ম্ম কর্ম্ম হীন অলসপ্রিয় জীবগুলি এতদিন পর এমন একটা পরচর্চ্চার বিষয় পেয়ে আনন্দে মেতে উঠলো। জীর্ণ শীর্ণ, প্লীহা যকৃতে পরিপূর্ণ গ্রামবাসী মহাখুসী হয়ে ভাগাড়ের চিল শকুনির

মত কথাটাকে নিযে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে আরম্ভ করলে। এতদিন পর একটা সুপেয় সুসেব্য পথ্য মিলেছে তাদের, কাজেই আনন্দ আর তাদের ধরে না।

এই অদ্ভুত জীবগুলি দিবারাত্র আমার বিয়ের কথা, স্ত্রীর ব্যবহারের কথা নিয়ে এমন ভাবে ঘোঁট পাকাচ্ছিল যে আমাদের বাড়ীর কেউ কোথাও গিয়ে যে দুদণ্ড স্থিরভাবে বসবে মজলিস-দার দের এই অনধিকার চর্চ্চা সে পথ রাখে নাই। হোত এক, করতো আর, শুনতো তিল বলতো তাল; কিন্তু সমালোচনাই তারা করতো, বক্র হাসিই হাসতো, সহানুভূতির ধার ধারতো না, গ্রামবাসীর লজ্জায় তারা লজ্জিত হোত না। আশ্চর্য্য এই ঢক্কা নিনাদকারীর দল! ভদ্রবংশে কেন তাদের জন্ম কে জানে? আবশুক, অনাবশুক, উচিৎ অনোচিৎ জ্ঞান নাই শুধু নিন্দা, কুৎসা, রঙ্গরস, তামাকুভক্ষণ আর গঞ্জিকা সেবন এই তাদের কাজ। কারও উপকার করবে না কিন্তু অপকার করতে বল তখন ধন প্রাণ দিয়ে সেই কাজে প্রবৃত্ত হ'বে। নিজের শতদোষ চোখে পরবে না; কিন্তু পরের যৎসামান্য ত্রুটী ধরে' একটা প্রলয় বাধাবার চেষ্টা করবে। সমাজ গড়বে না তারা শুধু তাকে উচ্ছন্নে দেবার সুবিধা খুঁজবে। এই তাদের কাজ আর এই নিয়েই তারা ব্যস্ত। এক একজন এক একটা শয়তান। হায়, এমনি দুরদৃষ্ট বাঙ্গালীর যে এইসব সমাজপতি নিয়েই চব্বিশ

ঘণ্টা বাস্ করতে হয়। এই যে আমার স্ত্রী পাড়া গাঁয়ে খোড়ো ঘরে থাকতে অপর দশজন গ্রাম্য রমণীর মত পুষ্করণীতে স্নান করতে, এঁটো বাসন কোসন পরিষ্কার করতে নারাজ কেন তা বুঝবে না, চিরকালের অভ্যাস একদিনে ত্যাগ করতে পারা সম্ভব কিনা ভাববে না, প্রতিকারের উপায় বলে দেবে না, সমবেদনা প্রকাশ করবার সময় পাবে না শুধু অনাবশ্যক প্রতিবাদ, অপ্রিয় মত প্রকাশ ও বিরুদ্ধ সমালোচনায় আমাদের সর্ব্বনাশ করতে তৎপর। অমার্জ্জিত অশিক্ষিত প্রকৃতি কাজেই কুটিলতায় ভরা। স্বীকার করি আমার স্ত্রীর ব্যবহার প্রশংসনীয় নয়, আমরাও তো কেউ এজন্য সুখী নই; কিন্তু তুমি সমাজপতি আমার দুঃখ ঘোচাতে তো উৎক নও—আজও না কখনও না—তখন কেন মিছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দাও? কিসে আমার ব্যথা দূরে যাবে সে চেষ্টা করবে না অথচ ব্যথা বাড়িয়ে দেবে এ কেমন আব্দার! সর্পের চেয়েও ভীষণ, ডাকাতের চেয়েও দুষমন্, খুনীরও অধম এই জীব গুলিকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয় না কেন, কে জানে? খুন ডাকাতি চুরি দাগাদারী, অত্যাচার অবিচার সব করতে পারে এরা আর করেও থাকে তথাপি আইন এদের কিছু বলে না। ওঃ আমার Qualification বুঝি এণ্ট্রান্স্ ফেল্! আইনের তর্ক আমার সাজে না!

স্ত্রী নিয়ে, স্ত্রী নিয়ে যত না হোক তার আলোচনা নিয়ে জ্বলে

পুড়ে' মরছি। হায়রে কপাল, হায়রে সামাজিক সংস্কার। লক্ষ্মী তার দীর্ঘকালের অভ্যাস ছাড়তে পারে না, তার জন্য সে কাঁদে, দুঃখ করে, ঘাড়ের ভূত নামাতে দুষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় পরিত্যাগ করতে সে সদাই উৎসুক কিন্তু অদৃষ্ট দোষে কিছুতেই পেরে উঠে না। এ কথা সমাজ বোঝে না, শোনে না; মা বাপ ও না। মন দেখে না, দেখতে জানে না শুধু কথার ফ্যাকরা ধরে' তীব্র সমালোচনা বিছুটীর মত গায়ে জড়িয়ে ধরে। ফল যে তার কত বিষময় তা বুঝে ও বুঝে না। এর চেয়ে অপরূপ আর দুনিয়াই কি আছে।

সে দিন রাত্রে আমি শুয়ে আছি, একটু তন্দ্রাঘোরে ও আচ্ছন্ন হয়েছি এমন সময় লক্ষ্মীদেবী কখন যে ঘরে এসেছে জানি না আমার গায়ে হাত দিতেই আমি চমকিয়ে জেগে উঠলুম। লক্ষ্মী ইতঃস্তত না করেই বললে "ওগো আর কথা সইতে পারছি না। তুমি তো সব বুঝছ তখন শ্বশুর শাশুড়ীকে বুঝিয়ে কিছুদিনের জন্য আমায় বাপের বাড়ী যেতে দাও, তুমিও সঙ্গে চল। তারপর সব শিখে কু অভ্যাস ত্যাগ করে আবার ফিরে আসবো, তুমিই সঙ্গে আনবে। তোমার পায়ে ধরি আমায় শোধরাবার সময় দাও।" লক্ষ্মীর চোখের জল আমার হৃদয়কে সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ করলে—মনে দয়ার সঞ্চার হোল; কিন্তু কি জানি অলক্ষে সমাজের শাসন বাণী আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়ে আমার সমস্ত শক্তি

মুহূর্ত্তের মধ্যে কেড়ে নিলে। পরক্ষণেই বুঝলুম যে পুরুষ আমি, নারীর আবেদন শোনবার সহিষ্ণুতা আমার থাকা উচিৎ নয়; তবু চিরকালের 'মেদা' আমি তাই কর্ত্তব্য পালনের শক্তি স্ত্রীকে অনুভব করিয়ে দিতে পারলুম না। শুধু অন্যমনস্ক ভাবেই বললুম "বেশ তাই হ'বে। আজ আর আমায় বিরক্ত করো না।" সুখী হোল কি দুঃখীত হোল তা বুঝলুম না তবে দেখলুম লক্ষ্মী মাটিতে শুয়ে আপন মনে কাঁদতে লাগলো। তবু সংসর্গ দোষে দুষ্ট আমি দয়ার্দ্র না হয়ে বরং উত্তেজিত হয়েই পাশ ফিরে শুলুম। দীর্ঘ নিশ্বাস, দুশ্চিন্তা রজনীর নিস্তব্ধতা শেষে নিদ্রার আহ্বান আমার শোক সন্তপ্ত চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়কে দ্রবীভূত করে সব ভুলিয়ে দিলে।

শোক সূত্রের অদৃশ্য সূক্ষ্মতম যোগ সূত্র কোথায় ছিল জানি না ঠিক্ প্রভাতের করস্পর্শে বিশ্বশিল্পী রচিত ইন্দ্রিয় গোচর বর্হিভূত নির্ম্মম সূচমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে নিদ্রালস চক্ষু উন্মিলীত করতে না করিতেই মনকে আমার নির্দ্দয় ভাবে বিদ্ধ করলে। বিদ্ধমন যন্ত্রণায় 'মাগো' বলে জেগে উঠ্লো। সূর্য্যের কিরণ তখন গাছের মাথায়, ঘরের আগায়। লক্ষ্মী তখনও ভূমি শয্যা অবলম্বন করেই আছে দেখলুম। তখন ও সে ফুপিয়ে কাঁদছে, কান্নার ঢেউ তখনও তার বক্ষ ছাপিয়ে উঠ্ছে। লক্ষ্মীর বেগবতী অশ্রুনদীর তরঙ্গ দুরন্ত তটস্থ আমি আমারও চঞ্চলতা উৎপাদনে

সমর্থ হয়েছিল, করুণার ধারা ব্যথিত বক্ষে জমাট বেঁধে আমাকে ও আকুল করেছিল কিন্তু মানুষের বিচিত্র স্বভাব আর সমাজের প্রভাব আমার প্রাণ সহানুভূতিতে পূর্ণ দেখে আমায় ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে এনে ফেললে। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

বাবা এ দিকে এক লম্বা চিঠি লিখে মদীয় শ্বশুর মহাশয়কে জানিয়েছিলেন যে গরবিণী রাজকন্যাকে পত্রপাঠ তিনি এসে যেন নিয়ে যান। পিতার পত্রের ভাষায় হোক্ কিম্বা কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় হোক্ দুই একদিনের মধ্যে লক্ষ্মী দেবীর পিতাঠাকুর সশরীরে এসে উপস্থিত হ'লেন। যে দিন তিনি গ্রামে এলেন গ্রামের লোকের সে কি আনন্দ। কবির কথায় বলা যেতে পারে 'সে কি কলরব সে কি হর্ষ।' হ'বারই কথা। একটা কথাকে তারা রীতিমত গড়ে, রং করে, চক্ষুদান দিয়ে শেষে প্রাণদানও করেছিল অসভ্য সময় সেটাকে পুরাতন জীর্ণ করে মারতে বসেছিল; কিন্তু আজ মন্ত্রৌষধি দিয়ে আবার নবজীবন নবযৌবন দান করবে, তাকে দীর্ঘায়ু করে তুলবে; সুতরাং এ আনন্দে এ কৃতিত্বে তাদের উৎফুল্ল হ'বার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান নয় কি? তাই গ্রামবাসীরা আজ আনন্দে ফেটে খুখানা হয়ে যাচ্ছে। সাবাস্ মুরুব্বিকের দল।

শ্বশুর মশায় যখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার শুনলেন তখন

দেখলুম যে তিনিও তাঁর মেয়েকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারলেন না। অন্ধ সমাজ তা বুঝবে না। যাই হোক্ তিনি আপন কন্যাকে নিকটে ডেকে অনেক রকমে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু লক্ষ্মীর ঘাড়ের ভূত কিছুতেই নামলো না। ক্রুদ্ধ পিতা স্বীয় কন্যাকে শত অপমানে অপমানিত করলেন; কিন্তু সময়ের ফেরে কিছুতেই কিছু হোল না। পরদিনেই অনন্যোপায় শ্বশুর মহাশয় লক্ষ্মী দেবীকে নিয়ে চন্দন-নগর রওনা হলেন। ওঃ গ্রামবাসীদের কি উল্লাস, কি হাসির ঘটা!

সংসারে আর আমার মন দেওয়া হোল না তাই পিতার অনুমতি নিয়ে চাকুরীর চেষ্টায় আজব সহর কলকাতায় এলুম। ইতিপূর্ব্বে কূপমণ্ডুকের মত গ্রামেই ছিলুম বিদেশে বাহির হ'বার সুযোগ ও অবকাশ ঘটে উঠে নাই। হাঁ তবে তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণনগরে এসেছিলুম সত্য; কিন্তু সে আসা যাওয়া ঠিক্ কয়েদীর মত। মাষ্টারের সঙ্গে এসে পরীক্ষাস্থলে বসে আবার মাষ্টারের সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসা। সপ্তমীর আবাহন মন্ত্র শেষ না হ'তেই শুনতে পেতুম যে বিজয়ার বিসর্জ্জন মন্ত্র পঠিত হচ্ছে। কাজেই আর তো কৈলাসে থাকবার হুকুম নাই। যা হোক্, কলকাতায় এসে যখন শিয়ালদহ ষ্টেসনে নামলুম তখনই আমার মাথা ঘুরে গেল। তারপর সদর রাস্তায় নেমে হরেক রকমের গাড়ী, অসংখ্য দোকান পশরা, নানাম্ কসমের লোকজন

দেখে আর অবিশ্রান্ত কলরব শুনে আমার সত্যিই ভয় হোল যে এ আবার কোনদেশে এলুম। কলিকাতা প্রবাসী জনৈক গ্রামবাসী সঙ্গে ছিল তাই রক্ষা নইলে চাকুরীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমাকে বাড়ী ফিরতে হোত, কিন্তু সেটা তখন পারতুম কিনা সন্দেহ, কেন না ষ্টেসনের কোনটা আগু কোনটা পিছু কিছুই বুঝতে পারি নাই। যাই হোক্ গ্রামবাসীর সাহায্যেও সঙ্গে তাদের মেসে এসে পৌঁছুলুম। সেখানকার আবহাওয়া, খাওয়া দাওয়া, নড়া চড়া, বসা দাঁড়া কিছুদিন আমার কাছে সমস্যার মত বোধ হয়েছিল; কিন্তু থাকতে থাকতেই কেমন সব সয়ে গেল।

পিতার ইচ্ছায় ও পরামর্শানুসারে আমি Shorthand Typewriting শিখিতে লাগলুম। এক বৎসর কেটে গেল তবুও শিক্ষা সম্পূর্ণ হোল না, আর হ'বে বলে ও আমার মনে হোল না। বলা বাহুল্য কলের জল, ইডেন গার্ডেনের হাওয়া মেসের বালাম চাল তখন আমাকে অনেকটা মানুষের মত গড়ে তুলেছিল তাই নিজেই মতলব ঠাওর করে একটা সওদাগরি আফিসে Typist এর কাজে নিযুক্ত হলুম। মাইনে হোল ষাট টাকা। মা বাবাকে এ সুসংবাদটা দিতে দেরী করলুম না আর এ কথা শুনে তাঁরা ও খুব খুসী হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ধারা ধরণ বদলিয়ে, চাষাটে ভাব ঘুচিয়ে পনের আনা এক আনা

চুল ছেঁটে বেশ একটু শ্রীমন্ত হয়ে একবার—বাড়ী নয়—এবার 'দেশে' ফিরলুম। বাবার ভারি আনন্দ। চাক্‌রে ছেলে বাড়ী এসেছে, আনন্দ হবারই কথা। মা ও খুব খুসী হ'লেন তবে একবার পুত্র বধূর অভাব অনুভব করে ছুই একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ্ করলেন। যাক্ সাতদিন দেশে থেকে যখন আবার কল্‌কাতায় ফিরলুম তখন দেখি এই কয়দিনের মধ্যেই আমি অনেকটা পিছিয়ে পরেছি আর কলকাতা সহরটা অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, কারণ তখন ঠিক বুঝতে পারি নাই তবে বন্ধু বর্গেরা বুঝিয়ে দিয়েছিল" একদিন যখন নাকি আমার কোন হাত ছিল না। পিছু পরে আছি ভেবে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটা কলকাতায় ভারি সংক্রামক।

মেসে এসে প্রবেশ করেই দেখি আমার Room-mate রমেশ আর দুইজন আমার অপরিচিত যুবকের সহিত পূর্ণানুষ্ঠানে পঞ্চমকারের প্রথমটির সাধনায় প্রমত্ত! আমায় দেখেই রমেশ বাঁকাস্বরে বলে উঠলো "বাঃ চমৎকার, এই যে নাম করতেই রামদাস। দাও, দাও ওকেও একগ্লাশ দাও।" রমেশ ছারবে না আমি ও খাব না অগত্যা ক্রুদ্ধ রমেশ আমায় লক্ষ্য করে সঙ্গীদের বললে "ওহে ও একেবারে পাড়া গেঁয়ে। civilisation এর মর্ম্ম বুঝতে ওর এখনও একযুগ্ কেটে যাবে Advance হওয়া কি মুখের কথা!" তাঁরা হাল ছেড়ে দিলে আমিও আশ্বস্ত

হলুম। অদৃষ্ট দেবী অলক্ষে যে জাল বোনে তার খবর তো মানুষ কখনও পায় না।

কিছুদিন কেটে গেছে। রমেশের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে এ মেসে আর থাকবো না ভাবছি, কেন না কলকাতার বাতাস বড় খারাপ, এমন সময় কি জানি লক্ষ্মীর কথা মনে হোল। আধমলিন শয্যার উপর শুয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করছি এমন সময় সময় পাশের ঘরের কোন ভদ্রলোক- একখানা পত্র আমার হাতে দিলেন। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন। এমন অসময়ে পত্র কোথায় হ'তে এল ভাবছি কেননা বাড়ী হ'তে পত্র এলে তো সকাল বেলায় আসে; কিন্তু এমনি মূর্খ আমি পত্র খুললে যে সমস্যা পূরণ হবে তা আর বুঝতে পারছি না। এদিক ওদিক চারিদিক দেখে, ডাকঘরের অস্পষ্ট ছাপ মোহর দেখেও কিছু মালুম হোলনা। অগত্যা পক্ষে খাম খানা ছিঁড়ে মূল পত্র খানা বের করলুম। উপরে বাঁকা হাতের চন্দননগর লেখা দেখেই আঁৎকে উঠলুম। ঘরে কেউ থাকলে মনে করতো আমি বুঝি স্বপ্নের ঘোরে লাফিয়ে উঠেছি। যাক পত্র খানটা একবার নয় দুবার নয় অন্তত পক্ষে বিশবার পড়লুম তবু যেন তৃপ্তি হোল না। অতৃপ্ত নয়ন তাই আবার পড়তে সুরু করলে।

চন্দন নগর
২১ শে শ্রাবণ।

শ্রীচরণ কমলেষু—

অসংখ্য প্রনামান্তে নিবেদন, স্বামী, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, জানি না এ দাসীর সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন কি না, কিন্তু অমার্জ্জনীয় যে সংসারে কিছু আছে তাহা জানি না। দোষ আমি নিশ্চয়ই করিয়াছিলাম কিন্তু যথেষ্ট শাস্তিও তো পাইয়াছি। হিন্দু রমণীর পতিই একমাত্র দেবতা, আমি সেই দেবতার পাদপদ্মের নিকট থাকিয়াও, হাতের কাছে জবা বিল্বদল পাইয়াও ভক্তি অঞ্জলি দিতে পাইলাম না কেন এবং সেই পূজনীয় বরনীয় দেবতাকে ছাড়িয়া বুদ্ধি দোষে বাপের বাড়ী আসিতেই বা চাহিব কেন? অপরাধ করিয়াছিলাম উপযুক্ত সাজাও পাইয়াছি; কিন্তু এখন অনুতপ্ত মন আমার নিশ্চয়ই দোষ মুক্ত তাহা আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন; কারণ মন খাঁটি না হইলে দোষ করিয়াছি তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারিতাম না। দেবতা কখনও ঘৃণা করিতে জানেন না এই বিশ্বাসে দেবতার শ্রীচরণে উৎসর্গীত এই মন জীবনে মরণে লুটাইয়া দিলাম। ভরসা, ও দয়া হইতে এ দাসী বঞ্চিত হইবে না।

ইতি—
শ্রীচরণাশ্রিতা
শ্রীমতি লক্ষ্মী দেবী।

ওগো এই অশিক্ষিতকে নারী চরিত্র কে বুঝিয়ে দেবে? ভাবলুম; অনেক রকম চিন্তা করলুম কিন্তু মীমাংসা কিছুই হোল না। লক্ষ্মীর ব্যথা সত্যই আমাকে বিচলিত করলে আমি চোখ বুজে একবার লক্ষ্মীর কথা, একবার আমার অদৃষ্টের কথা, এ-কবার মা বাপের কথা একবার সমাজের কথা ভাবতে লাগলুম। এমন সময়ে রমেশ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েই বললে "Hallo Ramdas, সন্ধ্যার সময় ঘুমুচ্ছো? আরে ছিঃ। তুমি যে পাড়া গেঁয়ে সেই পাড়া গেঁয়েই রয়ে গেলে। এস, এস একটু বেড়িয়ে আসি এখন।" মনটা বড়ই খারাপ হয়েছিল, ঘরের বদ্ধ বাতাসে বড়ই অসুস্থতা অনুভব করছিলুম তাই রমেশের প্রস্তাবে খুসী হয়েই বললুম "চল ভাই Strand এ একটু বেড়িয়ে আসি।" "বেশ, বেশ তাই হ'বে উঠ। তুমি যে পিঁজরে ছারতে চেয়েছ এই যথেষ্ট।" রমেশ এই বলে তার বাক্স খুলতে বসলো, আমিও একটা সার্ট পরে নিয়ে ইত্যবসরে প্রস্তুত হলুম। রমেশ খান কতক নোটের মত কি পকেটে রেখে আমার হাত ধরে নীচে এল। রাস্তায় এসে দেখি একখানা ভাড়ার মোটর দাঁড়িয়ে যেন আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিল। রমেশ আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমার পাশে বসেই ট্যাক্সি ওয়ালাকে 'চালাও' বলেই সিগারেটে একটা টান দিলে। আমি বললুম "কৈ বললে না তো Strandএ যাব।" "আঃ, সে সব আমার বলা আছে। চল

কোন ভয় নাই। মেয়ে মানুষ তো নও, যে modesty outraged হ'বে।" মটর তখন বেশ চলতে সুরু করেছে, কিন্তু Strand এ যাবার মতলব কিছুই বুঝতে পারলুম না। ইতিমধ্যে বৃষ্টি হ'তে আরম্ভ হয়েছিল তাই চারিদিকে পর্দা তুলে সহকারী মটর চালক আমাদের পরদানসীন্ করে তুললে। আমি নিস্তব্ধে নিজের ভাবে, আর রমেশ সিগারেটের ধূমপানে বিভোর। কিছুক্ষণ পরেই দেখলুম আমাদের গাড়ি একস্থানে দাঁড়িয়ে গেল। রমেশ তাড়াতাড়ি পরদা সরিয়ে দেখেই বললে "হা ঠিক জায়গায় এসেছ, তবে বাঁদিকে ঘুরিয়ে রাখ।" আমি বললুম "এই কি তোমার Strand নাকি?" "আঃ সবুর কর না, Strand তো আর পালিয়ে যাবে না। আমার একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে Strand এ যাব, একটু অপেক্ষা কর।" তারপর মটর চালককে লক্ষ্য করে বললে "ওহে ঘুরিয়ে রাখ না? পাহারওয়ালা ডান দিকে দেখলে এখুনি মজা দেখাবে।" তারপর দরজা খুলে নামতে নামতেই বললে "কি জানি বাবা দুনিয়া ছাড়া নিয়ম। সব দেশে Keep to the right শুধু আমাদের ইংরাজের রাজ্যে Keep to the left" রমেশ নেমে গেল আমি ভাবলুম গরজ বড় বালাই। এই Keep to the right কিম্বা left একই কথা কিন্তু গরজ তা বোঝে না। আমাদের জীবনের traffic এ ও এই right left এর মীমাংসা কে করে দেবে? হিন্দুর ছেলে জন্মিয়ে

একেক্ স্থায় শাস্ত্র বিৎ হয় তাই বুঝি কথাটা চট করে মনে এল, নইলে অতশত বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই। ইতিমধ্যে বৃষ্টিটা একটু যোরেই এল দেখলুম তাই সসব্যস্ত হয়ে একপাশ থেকে অন্যপাশে সরবার মতভাবে দাড়িয়ে উঠেছি এমন সময় রমেশের সঙ্গে ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়ে—কি আশ্চর্য্য! আমি চমকিয়ে উঠলুম। ঘৃণায় ও লজ্জায় আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠলো। কিছু বলবার বা করবার আগেই রমেশের সহ যাত্রী গাড়ীতে উঠেই আমাকেও টেনে বসালেন। আমি অবাক্। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল কিন্তু ব'লবার কোন জুত্ সই কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। রমেশ গাড়ীতে উঠে চালককে কিস্ ফিস্ ফি করে বলে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ও চলতে লাগলো। আমি বললুম "রমেশ আমায় নামিয়ে দাও আমি বাঁসায় যাব।" উত্তর দিলে রমণী "মশায়, বাঁসা আপনার আছে, আপনি যে ধাপার মাঠে থাকেন না তা জানি; কিন্তু এত কেন মশায়? আমরা কি আপনাকে খেয়ে ফেলবো?" আমি কিছুই বললুম না; মনে মনে রমেশের মুণ্ডুপাত করছিলুম শুধু। রমণী পুনরায় বললে "রমেশ তুমিও তো আচ্ছা ভদ্রলোক দেখছি, কৈ আমাকে তো introduce করিয়ে দিলে না!" আমি ভাবলুম যে এ রমণী কি graduate? কলকাতায় সব সম্ভব হয় তো বা তাই হ'বে। হায়রে এণ্ট্রান্স ফেল পুরুষ আমি। ইতিমধ্যে গাড়ী এক জায়গায় থোড়

নিলে ও কিছুক্ষণ চলেই থেমে গেল। পল্লীর সাড়া শব্দে বুঝলুম যে এ কোন্ স্থান। গাড়ি দাঁড়াইতেই রমণী আমার হাত খানা খপ্ করে চেপে ধরলে পাছে অভদ্রতা ও রাস্তার মাঝে একটা কেলেঙ্কারি হ'বে ভেবে আমি আমার কঠোরতাকে ফুটিয়ে তুললুম না। আকাশের ঘুড়ি যেমন নিস্তব্ধে স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য্য হয় না তেমনি বুঝি আমারও নির্ব্বাক চেষ্টা কৃতকার্য্য হোল না। হস্তাবদ্ধ হয়েই রমণীকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলুম।

দ্বিতলের একখানি প্রকাণ্ড ঘরে প্রবিষ্ট হ'বার মাত্রই একজন চসমা ধারী যুবক, সেই সে দিন মেসে বুঝি দেখেছিলুম সর্ব্ব প্রথমে রমণীকে সাদর সম্ভাষণে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। নাম শুনলুম পুষ্পবালা; ঘরে বসতেই চারিদিকে পুষ্প বৃষ্টিও হ'তে আরম্ভ হোল। দিদিমার ইন্দ্রের সভা, অপ্সরীর কথার গল্প মনে হোল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি এমন সময় উপরোল্লিখিত যুবক আমায় লক্ষ্য করে বললে "বা! আজ আমাদের বড় সৌভাগ্য রামদাস বাবুও এসেছেন।" ব্যাভিচারেরা মধ্যে পড়ে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ গিস্ গিস্ করছিল তাই রাগত ভাবেই আমি রমেশকে অনেক কথা বললুম। আমার মান মর্য্যাদা আভিজাত্য সকল কথাই বলেছিলুম; কিন্তু রমেশ তো কোন কথাই কাণে তুললে না শেষে ঠেকিয়ে দিলে পুষ্পবালাকে; চতুরা সে অনেক কথা বলে' বোল

কলায় নিপুনা সে, অনেক কলার অভিনয় করে আমাকে স্তব্ধ ও বিস্মিত করলে। একে নাম ডাক 'মেদা' তার উপর হতবুদ্ধি কাজেই আর বড়াই না করে চেপে যেতে বাধ্য হলুম। ইতিমধ্যে জনান্তিকে কথা বার্ত্তা চলতে লাগলো। বিস্ময়াবিষ্ট নয়ন আমার ঘর খানির সজ্জাভরণ দেখতে তখন ব্যস্ত হোল। দেওয়ালের গায়ে চিত্রকরের বিচিত্র বর্ণের আল্পনা, মাঝে মাঝে শিল্পীর তুলিকার অপূর্ব্ব রচনা, চতুষ্পার্শে সজ্জাকরের সজ্জা চাতুরী, মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোকের বাহাদুরী মেজের উপর চারু চিকণ কারপেটের বাহার পার্শ্বদেশে কিংখাপ মোড়ক বালিশের পাহাড় আরও নয়নারাম কত কি ঘর খানিকে সত্য সত্যই শোভাসম্পদে অতুলনীয় করে তুলেছিল। পাশেই চেয়ে দেখলুম এক ত্রয়োদশ বর্ষীয়া রূপসী আপনার ভাবে যেন আপনিই মগ্ন। সলজ্জ দৃষ্টি জানি না কেন মুহু মুহু ঐ রূপসীর পানেই সংবদ্ধ হচ্ছিল, যতই দেখছিলুম দেখবার স্পৃহা ও ততই বেড়ে উঠছিল। হায় এমনি করেই বুঝি মানুষ মৃত্যুর পানে ছোটে এমনি করেই বুঝি পতঙ্গ আগুনের মুখে লাফিয়ে পড়ে। ঐ যঃ, সুন্দরীর চোখে আমার চোখে এক হয়ে গেল। চোখের ভাষা বুঝি না, ভাব বুঝি না, বোঝবার শক্তি ও নাই নইলে হয়তো বুঝতুম যে ঐ চাহনির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লুক্কায়িত ছিল। যাই হোক আঁখি আর বামে ফেরাব না মনে করে ডাইনে চাইলুম দেখি অপর

একজন যুবক আপন মনে তাম্বুল চর্ব্বনে ও ধূম পানে ব্যস্ত। গা খোঁকা শুঁকি হয়ে তখন যে যার সে তার দলে ভিঁড়ে গেছে দেখলুম। শুধু আমিই ইন্দ্রজালের মধ্যে পরে' হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছি। ভয়ে একপাশ হ'ব ভেবে সরে যেতেই—কি বিড়ম্বনা সুন্দরীর গায়ে পরলুম। সসম্ভ্রমে ক্ষমা চাইব এমন সময়ে রূপসী ধীরে ধীরে বললে "না না, আপনার লজ্জিত কিংম্বা সঙ্কুচিত হ'বার কোন কারণ নাই। আমি বেশ বুঝেছি এটা আপনার অভিপ্রেত নয়"। আশ্বস্ত হলুম কিন্তু উত্তর দেবার কথা যোগাল না তাই স্থির ভাবেই বসে রইলুম। পুষ্পবালা এতক্ষণ নীরব ছিল কিন্তু আর সে পারলে না তাই বললে "যা হোক্ ভাই দৌলত (বুঝলুম সুন্দরীর নাম দৌলত) ভাগ্যিস্ রামদাস বাবু ভুলে তোমার গায়ে পরেছিলেন তাই কথা ফুটলো, নইলে এতগুলো লোক আমরা এলুম একটা কথাও বললে না।" মহিষ মর্দ্দিনী রূপিণী চত্বারিংশ বর্ষীয়া একটি রমণী কোথায় ছিলেন এতক্ষণ জানি না ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই বললেন "পুষ্পবালা, কিছু মনে করো না মা। দুলীর যে কি হয়েছে তা জানি না কেবল কথায় কথায় অভিমান আর রাগ। যেটা বলবো, করতে হ'বে না ঠিক্ সেইটেই করে বসবে। অমন বদমেজাজী মেয়ে বাপের জন্মেও দেখি নাই। এই দেখ না নিমাইবাবু (চশমাধারী বাবুকে দেখিয়ে বললেন) আজ মাসাধিক কাল কত সাধ্য সাধনা

করছেন, সত্যি কথা বলছি মা নিমাই এর আমার দেবার কসুর নাই; মুখের কথা না খসাতেই ভাল মন্দ জিনিষ নিয়ে এসে উপস্থিত, তবু ছুঁরি এমনি নেমকহারাম যে নিমাই এর কাছে শুধু কি তাই মা, কোনও পুরুষের কাছে আসতে চাইবে না। একি অন্যায় আব্দার মা বলতো?” দেখলুম দৌলতের দুটি আঁখি সিক্ত হয়ে উঠেছে বুকের মাঝে যেন ঝাঁড়াষাঁড়ির বান্ ডেকে যাচ্ছে। কেন যে এ ভাবটা বুঝলুম তা বলতে পারি না, তবে শোনা কথা বলছি হয় তো বা Telepathic force.

তারপর আর বাজে কথা কইতে না দিয়ে আজ সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে এই আশ্বাস বাণী দৌলতের মাকে শুনিয়ে কাজের কাজী রমেশ আসর জমাবার ব্যবস্থা করতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই লাল সবুজ কাল লেবেল আঁটা বহুত কসমের বড় ছোট মাঝারি বোতল, সোডা ওয়াটারের, লাইমেডের বোতল, পান সিগারেটে ইত্যাদিতে ফরাস পরিপূর্ণ হোল। সে যেন বড় লোকের বাড়ীর বিয়ের আযোজন কিম্বা ‘ভুতের বাপের শ্রাদ্ধের’ উদ্যোগ। দারুণ উৎসাহের সহিত রমেশ নিমাইবাবু ও অন্য অপরিচিত বাবুটি পুষ্পবালা প্রদত্ত পরিপূর্ণ গ্লাস অবাধে গলাধঃ-করণ করতে আরম্ভ করলে। দৌলত তখনও নীরব। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর যখন পুষ্পবালা দৌলতকে এমন কি একটি পান সিগারেটও হাতে করাতে পারলে না তখন প্রেমিক

নিমাইবাবু দৌলতের কাছে এসে গায়ে হাত দিতেই দলিতা ফণিনীর ন্যায় রোষদৃপ্ত নয়নে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো "আপনি আবার গায়ে হাত দিচ্ছেন? আপনার লজ্জা নেই?" দুঃখে ও রাগে দৌলত কাঁদিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে দৌলতের মা ঘটনাস্থলে অবতীর্ণা হয়ে রণরঙ্গে মেতে উঠলেন। দৌলতকে লক্ষ্য করে যে সমস্ত গালিবর্ষণ করতে লাগলো তা শুনে সত্য সত্যই আমার আপাদ মস্তক জ্বলে উঠলো; কিন্তু হায়রে কপাল, এ যে নরক কুণ্ড, এখানকার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার কথা বার্ত্তা যে শিষ্টাচার সম্মত হ'বে মনে করাই দোষ। ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখে পাকাজুয়ারী রমেশ নানারূপ কথার ভাঁজে রণচণ্ডীর কথঞ্চিৎ সন্তোষ উৎপাদন করে বিদায় দিল—শাসন বাক্য প্রয়োগ করতে করতে সরোষেই, দৌলতের মা গৃহান্তরে গমন করলে। দৌলত, হায় দৌলত তখনও অশ্রুসিক্ত নয়নে ঘর্ম্মাক্ত বয়ানে নিজের অদৃষ্ট বুঝি ভাবছিল, আর কি জানি মাঝে মাঝে তার কাতর দৃষ্টি আমার পানেই আকৃষ্ট হচ্ছিল! কে জানে কিসে কি হয়!

যাই হোক দৌলতের উপর অত্যাচারটা বন্ধ হ'ল সত্য; কিন্তু সকলের তাল পড়লো শেষ আমার উপর। তিনটি পরিপূর্ণ গ্লাস আমার মুখের কাছে এক এক করে উপস্থিত হোল শেষে দুটি হাত সরে গেল; কিন্তু পুষ্পবালার দক্ষিণ হস্তের গ্লাস আমার

মুখের কাছেই রয়ে গেল। তথাপি আমি অচল অটল। কি জানি কুহকিনী কি ভেবে তার বাম হস্ত আমার স্কন্ধের উপর স্থাপিত করে আত্মীয়তার সুরে আমায় বললে "রামদাসবাবু, আমার আজ অপমানিত হ'বারই দিন, তবে আপনি যদি দয়া করে আমার মান রক্ষা করেন তাহলে—"। আমি বাধা দিয়েই বললুম "এই কি মান রক্ষার কথা?" হাঁ, রামদাস বাবু, আমাদের মান রক্ষা এমনি ভাবেই হয়, আর ভদ্রলোক আপনি মান রাখতে জানেন তাই এতদূর অগ্রসর।" তখন গ্লাসটা বরাবর আমার মুখের কাছে উঠে ওষ্ঠদ্বয়কে একরকম স্পর্শ করেছে বললেও ক্ষতি হয় না। পুষ্পবালার স্বর আমার দুর্ব্বলতা আনয়ন করলে—বুঝি অনেকেরই করে—হায়রে পাপিষ্ঠ আমি আর বাধা দিতে পারলুম না। গলাধঃকরণ হ'তে না হ'তেই সংসারের বৈচিত্রতা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করলুম। আনন্দ হোল অথচ উপভোগ হোল না শুধু মরীচিকার মত চোখের সামনেই ঘুরতে লাগলো, কিছুতেই ধরা দিলে না, বুঝি বা কেউ ধরতে ও পারে না।

প্রথম হ'তেই সৌলত আমায় কি চোখে দেখেছিল জানি না সে শুধু আমারই পানে আমারই আশে আমারই পানে সতৃষ্ণ নয়নে বারবার তাকাচ্ছিল, কি বলি বলি করেও বলতে পারছিল না। আমি তার হাব ভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছিলুম

কিন্তু চিরকালের ভাল-মানুষ আমি হয় তো সেই জন্যই কিছু মুখ ফুটে বলতে পারছিলুম না কিম্বা হয় তো পান পিপাসা আমার বাকরোধ করছিল। ইতিমধ্যে নাচ গান বেশ পুরামাত্রায় আরম্ভ হয়েছিল, সঙ্গীদের হর্ষধ্বনি ঘরখানিকে বেশ সরগরম করে তুলেছিল; আর নির্ব্বিবাদী আমি, দুষ্টবুদ্ধি তখন আমার পথ প্রদর্শক, গ্লাসের পর গ্লাস শেষ করছিলুম। প্রথম প্রথম ছেলেরা যখন খেতে শেখে তখন খাবার ইচ্ছাটাও তাদের প্রবল হয়। আমারও বুঝি তাই হোল; এক আধবার ভাবছিলুম ছিঃ ছিঃ জেনে শুনে কেন এ বিষ পান করছি, অধঃপাতে যাবার রাস্তায় কেন পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হচ্ছি; কিন্তু কেমন মজা হাত মুখ সমান ভাবেই চলছিল। পাশে চেয়ে একবার দেখলুম দৌলতের কাতর দৃষ্টি তখনও আমারই উপর আবদ্ধ যেন আমারই লালসার বাধাপ্রদানে উদ্যত; কিন্তু আমার রক্ত চক্ষু, সে কাতরতা গ্রাহ্য করেও করলে না। দ্বিগুণ উৎসাহে একটি পরিপূর্ণ গ্লাস তুলে মুখে ধরলুম। অবসন্ন কম্পিত হাত হ'তে শূন্য গেলাসটা আপনিই পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও উন্মত্ত অবস্থায় মুদ্রিত চক্ষে কার কোলে পড়ে গেলুম। বাস, তারপর আর জানি না, শুধু কখন কখনও মনে হচ্ছিল যেন কিসের কোমল স্পর্শ আমার মস্তকের কেশে আবদ্ধ, কার রম্যাঞ্চল আমার ঘর্ম্মাক্ত কপালের উপর স্থাপিত, কার সুদীর্ঘ তপ্তশ্বাস আমার হিম দেহের উপর প্রবাহিত। নাচ

গান যে কখন ভেঙে গেছে এমন জমাট আসর কখন যে গলে গেছে তা জানতেও পারি নাই। চোখ খুলে চাইতেই প্রথমেই দেওয়ালের গায়ের ঘড়ির পানে লক্ষ্য হোল। দেখলুম দুইটা বেজে গেছে। সব নিস্তব্ধ, জাগ্রত শুধু আমার প্রাণের স্পন্দন, আর ঐ ঘড়ির বুকের আলোড়ন। ভয়ে উৎকণ্ঠায় উঁচু দিকে চাইলুম, তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে চোখ ঝাপসে গেল; নীচু দিকে পলক ফেলতে গিয়ে বোতলের রাশ চোখে পরলো, ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নিলুম দৃষ্টি পড়লো তখন অদূরোপবিষ্টা দৌলতের উপর। তার পলকহীন চক্ষের সিক্ততা, বিরামহীন উষ্ণ নিশ্বাসের প্রবলতা, সৌন্দর্য্য মণ্ডিত তেজোদৃপ্ত বদন আর সরল সুন্দর সম্ভাষণ আমার আধজাগ্রত আধসুষুপ্ত প্রাণ বিদ্ধ করলে। যন্ত্রণায় কি আশঙ্কায় প্রয়োজনে কি অন্যমনে জানি না আপনাকে তৃষ্ণার্ত্ত অনুভব করলুম। তাই মুখ দিয়ে 'জল' কথাটা কেমন অজ্ঞাত সারেই বেড়িয়ে পড়লো। তার সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর অপেক্ষা না করেই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে অদূরবর্ত্তী সরাই হ'তে একগ্লাস জল এনে আমার মুখে ধরলে, আমিও প্রথম ভাগের গোপালটির মত কোনরূপ উচ্চ বাচ্য না করেই গ্লাসটা নিঃশেষ করে ফেললুম। স্নেহে ভরপূর দৌলত 'আর দেব' জিজ্ঞাসা করে যথাস্থানে গ্লাস রাখবার জন্ত উঠে গেল। আমি শুধু 'না' বলেই পাশ ফিরে শুলুম। দৌলত গেলাসটি যথাস্থানে রেখে এবার আমার

শিয়রেই বসে বালিস হ'তে আমার মাথাটা তুলে নিয়ে নিজের কোলে রাখলে। নিজেই বললে "নামিয়ে দিয়েছিলুম, দিয়েছিলুম নয় দিতে বাধ্য হয়েছিলুম কিছু মনে করো না।" বুকে ব্যথা অনুভব করছিলুম এবার যেন সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তাই কিছুই বলতে পারলুম না যেমন শুয়ে ছিলুম তেমনই রইলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার মনে হোল যেন দৌলত কাঁদছে। পাশ ফিরে দেখলুম অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলুম, কি বিপদ, সে আরও কেঁদে উঠলো। বুঝি বেগ সামলাতে না পেরে দৌলত তার আকুল বাহু অবসন্ন দেহ আমার উপর অবাধে ছড়িয়ে দিয়ে কান্নার মাঝে বলে উঠলো "রামদাস বাবু এই আশ্রয় হীনাকে পদাশ্রয়ে রাখুন। আজ সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর এই ক্ষুদ্র দৌলত একদিকে। সে তার রাক্ষসী মানুষ করা মাকে উত্যক্ত করেছে আর দেনেওয়ালা বাবুকে তাড়িয়েছে, সবার সঙ্গে কাটান ছিটান করেছে শুধু ভদ্রের আশায়। আজ কপাল গুণে ভদ্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি, এ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়বো না। শুনুন রামদাস বাবু দৌলত শুধু অদৃষ্ট দোষে পতিতাদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে এই তার অপরাধ; কিন্তু তার দেহমন এখনও উচ্ছিষ্ট নয় কখনও হ'বে না। রামদাস বাবু, আপনার বুকে দয়া আছে আপনি আমায় এ বিপদ হ'তে রক্ষা করুন নয় ঘৃণাভরে আপনিই পদদলিত ক'রে আমার সব

শেষ করে দিন। এই মায়াবিনীদের পুরী হ'তে আমায় রক্ষা করুন, আপনার মঙ্গল হ'বে, ভগবান আপনার ভাল করবে।" প্রবল বন্যার অবাধ জলরাশির মত অশ্রুরাশি দৌলতকে বাধা দিলে, সে আর বলতে পারলে না। কিন্তু আমি একি বিপদে পড়লুম? অশিক্ষিত অমার্জ্জিত মন আমার বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো; তাই বিপদ কাটাবার আশায় আমি বললুম "দৌলত, আমি গরীব আমার মাথায় ভর করলে আমারও মাথা থাকবে না আর যে ভর করবে তারও না। সব ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাবে। তারপর আমি বিবাহিত, সংসারী গৃহস্থ আমার গৃহের সর্ব্বনাশ হবে সংসার উচ্ছন্নে যাবে।" হায়রে, মাটির নীচে বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, পাথরের বুকে ঝরণা যখন উৎসারিত হয়, ভালবাসা যখন পক্ষ বিস্তার করে, প্রেম যখন পাত্রস্থ হয় তখন তাদের মাথার উপর শত বাধা কি তারা লক্ষ্য করে? তাই বুঝি ক্রন্দন নিরত দৌলত আমার কথা কাণে না তুলেই বললে 'রামদাস বাবু, আমায় বেশ্যা বলে ঘৃণা করবেন না। দেহমন আমার এখনও কলুষিত নয়, হ'তেও দেব না। আজ ভদ্র সন্তান পেয়েছি, ভগবান আমায় সুযোগ দিয়েছেন, আমি ও আপনাকে আপনার পায়ে বিকিয়ে দিয়েছি। আপনি মানুষ আপনার প্রাণে কি দয়া নেই? স্ত্রীধর্ম্ম বজায় রাখতে কি আপনার মন বলে না? পতিতার মধ্যে হ'তে কি এক গৃহস্থ কন্যাকে রক্ষা করবার সাহস আপনার

নাই? বেশ্যার হাত হ'তে কুলকামিনীকে পরিত্রাণ করবার শিক্ষা কি আপনার নাই? আপনার অযাচিত আমি তাই কি উপেক্ষা করছেন? গৃহস্থ আপনি ধর্ম্মকে রক্ষা করুন আমার এই পিশাচ পুরী হ'তে উদ্ধার করুন। আমার মন বলছে আমি উদ্ধার পাব আর সে উদ্ধার কর্ত্তা আপনি।" এই শোযোক্ত কথা গুলি দৌলত খুব জোরের সহিত বলেছিল তাই বুঝি আমার প্রাণে তার প্রতিধ্বনি উঠে আমায় বিচলিত করলে। কি বলবো ভাবছি এমন সময়ে দৌলত করুণ কাতর স্বরে বললে "ওগো (এই সম্ভাষণে সত্যই আমার ধৈর্য্যচুতি হোল,. আমি যেন আপনহারা হয়ে গেলুম) তোমার আমাকে পায়ে রাখতেই হ'বে। বল পায়ে রাখবে? জানি এতে তোমার গৌরব বাড়বে না কিন্তু দৌলতের যে ইজ্জত রক্ষা হ'বে সে যে নারীধর্ম্ম পালন করতে পারবে। আজ তুমিই আমার আশ্রয়, তুমিই আমার সব। যখন আমার এই খাঁটি মন তোমায় চায় কারও সাধ্য নাই, এমন কি তোমারও না যে তুমি আমায় পরিত্যাগ কর।" সজোরে উচ্চারিত কথাগুলি আমার বুকের মধ্যে একটা দারুণ ঘাত প্রতিঘাত তুলেছে এমন সময় দৌলতের আরক্তিম মুখ আমার মুখে এসে পড়লো—না জানিনা ঠিক মনে পড়ে না, দৌলত যেন স্বর্গের অমিয় ধারা আমার মুখে ঢেলে দিলে, ছড়িয়ে দিলে আমার চোখে সোণার স্বপন, আর প্রদান করলে আমার বুকে অযুত হস্তীর বল।

চার পাঁচ মাস কেটে গেছে। হাবড়ার একখানা একতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমি এখন, বলা বাহুল্য, দৌলতকে নিয়েই থাকি। পাড়া প্রতিবাসী আমাদের স্ত্রী পুরুষ বলেই জানে আর আমরা, আমরাও তাই জানি, মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে জানি। আজকাল মাইনে পাই একশত টাকা, কাজেই আমরা দু'জনা ও একটি ঝি এর মধ্যেই বেশ চলে যায়। একটা কথা বলা এখানে যেন বিশেষ প্রয়োজন তাই বলছি যে ব্যাভিচারিনীদের সহবাসেও দৌলত তার মতিগতি ঠিক রেখেছিল, কালের ভ্রুকুটি সহ্য করেও আপন চরিত্র বজায় রেখেছিল এ তার বহুপুণ্যের ফল এ তার বড় জোর বরাত। ভীষণ আবর্ত্তনের মাঝে রমণীর ধর্ম্ম যা কাচের বাসন চেয়েও ভঙ্গুর ভঙ্গ-প্রবণ সেই ধর্ম্মকে বজায় রাখায় যে কত চরিত্র বল প্রয়োজন তা দৌলত জানতো আর জানতো বলেই আজ তার এই অসম্ভব পরিবর্ত্তন। চরিত্র জয়ে জয়ী যে ভগবান বুঝি তার সহায়।

হাঁ, দৌলতের সে অনেক কথা, বুকভরা তার ব্যথা, চোখ ভরা তার জল, প্রাণের মাঝে অবিশ্রান্ত কোলাহল। সে পরিচিত বংশের মেয়ে, গঙ্গাস্নানে এসে সঙ্গীহারা হয়ে কুহকিনীর জালে আবদ্ধ হয়েছিল। কত কেঁদেছিল, অসহ্য বেদনার মাঝে কিরূপে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েছিল, তার ইয়ত্তা আজ আর কে করবে? নির্য্যাতীতা অসহায়ার উপর যখন ভুজঙ্গিনীরা বিষের খোলস চড়িয়ে দিয়ে

বারাণ্ডায় দাঁড় করালে তার সে দিনের উন্মাদনা, হায় দৌলতের সে বিকট যন্ত্রণা আজ আর কে উপলব্ধি করবে? তারপর একতুই করে যখন বাবুর দল তার কাছে এসে তাদের ব্যর্থ প্রণয়ের অব্যর্থ অস্ত্র সন্ধান করতে আরম্ভ করলে তখনই বা তার কাতরতা কত তা আজ কে বুঝবে? দিনের আলো, রজনীর মত্ত আহ্বান, চাঁদের কিরণ, বসন্তের বাতাস, ফুলের সুবাস, লুব্ধ প্রেমিকের প্রাণ প্রলোভনের দান যখন তার হৃদয় কোরককে অবিশ্রান্ত তোষামুদির ভিতর দিয়ে প্রস্ফুটিত হ'বার পথ বলে দিলে তখন তার বুকের অসহনীয় যাতনা কোন্ চিত্রকর আজ ফুটিয়ে তুলবে? 'রক্ষা কর, ভগবান রক্ষা কর' বলে আকুল প্রাণে উত্তেজিত হয়ে অত্যাচারের বিরোধী হোত যখন তখন তার উগ্রতা কত আজ কে সন্ধান করবে? দৌলত এখন সকল কথা স্মরণ করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে উঠে, মাঝে মাঝে সংজ্ঞালুপ্ত ও হয় সে। কিন্তু শাস্ত্রের ধারা তার প্রাণের পবিত্রতা দেখেও দেখবে না। সমাজের নীতি অনুতপ্তের ব্যথিতের, পবিত্রের কাহিনী নিয়ে মাথা ঘামাবে না, দুনিয়ায় কেউ তার কথায় বিশ্বাসও করবে না। আশ্চর্য্য! যাক্ আমি শাস্ত্র ছাড়া, সমাজ ছাড়া, দুনিয়া ছাড়া তাই মোহের আবেগই হোক্ কিম্বা বিবেকের ডাকেই হো'ক্ দৌলতকে আঁকড়ে ধরেছি, বুঝি বা মরণেও এ বেষ্টন নষ্ট হ'বে না, আর দৌলত, ভাবে কিম্বা ভাষায় প্রকাশ অক্ষম, দৌলত তার আত্মার সঙ্গে

আমার আত্মার অনুভূতি মিশিয়ে আমাকে আপনার হ'তেও আপনার করেছে, নিজের সবটুকু আমাকে সে বিলিয়ে দিয়েছে। দৌলতের শান্তি তার যথা সর্ব্বস্ব সবই আমি, আমাতেই সে একেবারে মিশে গেছে।

দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল, কেন না কর্ম্মক্ষেত্র কলকাতা সহর যেখানে অন্ধ নির্দ্দয় সমাজের কুটিল হাসি নাই, বৃথা একাধিপত্য ইচ্ছা নাই, অনাবশ্যক কার্য্যে মতি নাই, অন্যায় আব্দার নাই—হায়রে মন্দভাগ্য আমি, সেখানেও সুদূর পল্লী গ্রামের শয়তানী সমাজের অনুসন্ধিৎসু রক্ত চক্ষু পড়লো এই দুঃখ। আমাদের এই কাহিনী কলঙ্কের কাহিনীতে পরিণত হয়ে—হবারই কথা গ্রামে বৃদ্ধ পিতামাতাকে স্পর্শ করলে সমাজপতিদের ইঙ্গিত ও আদেশানুযায়ী নির্দ্দোষ পিতা প্রায়শ্চিত্ত করে, মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে সমাজের মান মর্য্যাদা রক্ষা করলেন। চমৎকার বিধি, চমৎকার শাস্ত্রকারের প্রায়শ্চিত্ত-যোগ, চমৎকার মর্য্যাদারক্ষা!

একদিন সন্ধ্যার পর ঘরে বসে দৌলত ও আমি গৃহস্থালীর কাজে মন দিয়েছি এমন সময় আমার টেবিলের ড্রয়ার হ'তে লক্ষ্মীদেবীর সেই পত্রখানটা-মোটে সেই একখানাই পত্র এতদিন যেটা কোন্ আবর্জ্জনার মাঝে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছিল, আজ হঠাৎ বেড়িয়ে পড়লো। দৌলত পত্রখানটা দেখতে চাইলে, আমিও কেমন তার হাতে দিয়ে দিলুম। সে পত্র পড়তে ব্যস্ত

এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ আমার কাণে গেল। এমন অসময়ে যার সময়ে কেউ আসে না তার এমন অসময়ে রাত্রিকালে কে আসতে পারে ভেবে দরজার দিকে আমি নিজেই অগ্রসর হলুম। দরজা খুলতেই দেখি একখানা সেকেণ্ড ক্লাশগাড়ি দরজার ধারে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আর পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমার শ্বশুর আশুতোষ চৌধুরী। লজ্জায় আমার মুখ এতটুকু হয়ে গেল ভয়ে চোখ কপালে উঠলো। আশঙ্কায় আমার শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। কারও মুখে কথা নাই। গাড়ির দরজা বুঝি আপনিই খুলে গেল। বেশ দেখলুম ধীরে সন্তর্পণে অবতরণ করছে আমারই বিবাহিতা স্ত্রী শ্রীমতি লক্ষ্মী দেবী। গাড়ি হ'তে অবতীর্ণা হয়েই লক্ষ্মী আমার কম্পিত পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বললে "স্বামী আমার, তুমি যাই হও যেখানে থাক আমার দেবতা। এ দাসী তোমার। তুমি কেন তাকে ভুলে যাচ্ছ? তোমায় পেয়েছি, চিনেছি, আমায় পদাশ্রয়ে রাখ।" জ্ঞানলুপ্ত হয়ে কখন চোখ বন্ধ হয়েছিল জানি না কিন্তু পৃষ্ঠদেশে কিসের স্পর্শে আমার জ্ঞান ফিরে এল চোখও খুলে গেল। চোখ চাইতেই দেখলুম সেই পত্রহাতে দৌলত, পায়ের নীচে লক্ষ্মী আর চারিদিকে কোথাও কিছু নাই। ভাড়ার গাড়ী শ্বশুর সব কোথায় অদৃশ্য। কঠোর সত্য যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো একটা কিছু করবো ভাবছি এমন সময়ে দৌলত লক্ষ্মীর হাত ধরে' তুলে বললে "কৈঁদোনা

দিদি, তোমার ধন তোমায় বুঝিয়ে দেব আমার বড় সৌভাগ্য।" এক হাতে লক্ষ্মী অপর হাতে দৌলতকে ধরে আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। তখন মিলনের গানে বিভোর বিশ্ব তাপিতের জন্য তৈয়ারী তার কোমল ক্রোড় পেতে দিয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা আর মাথার উপর হ'তে চাঁদের সুস্নিগ্ধ কিরণ ভগবানের আশীষ বহন ক'রে এনে লাঞ্ছিতের অভিষেক করলে।

——•——

বিপর্য্যয়ে

সেবার দেশে ম্যালেরিয়া রাক্ষস যখন 'আও মাও খাও, মানুষের গন্ধ পাও বলে' গ্রামের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে কালে অকালে সময়ে অসময়ে হাসি কান্নার মাঝে নির্দ্দয় ভাবে উদরস্থাৎ করছিল তা বেশ মনে আছে। গ্রামে বালকের কোলাহল, যুবকদের আমোদ প্রমোদ, বৃদ্ধদের সামাজিক বৈঠক কিছুই ছিল না—যারা ভাগ্য বলে রাক্ষসের মুখ হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছিল তারাও ভয়ে উদ্বেগে উৎপীড়নে ত্র্যস্ত হয়ে উঠেছিল। গ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা তখন যমদূতের দল। গ্রামখানির বুকে বসে তারা যখন তাদের দৈনন্দিন, জমা খরচ বহির প্রতি পৃষ্ঠা উল্টে জমা খরচ বাকি ওয়াশীল তুলে' কৈফিয়ৎ টেনে এমন কি কপাল টুকীতে পর্য্যন্ত লিখে খাতার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়ে তুলছিলো ঠিক সেই সময়েই হায়রে বিড়ম্বনা আমায় একবার গ্রামে আসতে হয়েছিল। আমিও খাতা নিয়ে হিসাব নিকাশ করতে এসেছিলুম তবে চিত্র গুপ্তের দপ্তরের আদায়কারী গোমস্তা হ'য়ে না এলেও রাম রাম গুপ্তের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বলেই আমার এই শুভ আগমন।

রাম রাম গুপ্ত কলিকাতার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ধনী। বাগান বাড়ী মোটর গাড়ী টাকা কড়ি পেয়ার পেয়ারী বড়লোক হ'তে হ'লে পুরাকালে প্রবাদ যা রেখেছিল আধুনিক কালে লোকে যা' রাখে রাম রাম বাবুর সে সকল গুলিই আছে। কোনটির কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। কলকাতা সহরের সকলেই তাঁকে চিনতো। যদি কোনদিন শুনতেন যে কেউ তাঁকে চেনে না অমনি তার সাত গুষ্টিকে এনে যে যে রকম তার সে রকম ব্যবস্থা করে আপনাকে চিনিয়ে দিতেন। হাবড়া কিম্বা শিয়ালদহ ষ্টেসনে নেমে রাম রাম বাবু বললেই একটা কুকুর বিড়ালেও তাঁর বাড়ী দেখিয়ে দিত। কলিকাতা সহরে এরূপ সুপরিচিত হওয়া বড় সোজা কথা নয়; কিন্তু তিনিও বড় সোজা লোক ছিলেন না। নাম কিনবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থের তাঁর কোনদিনই অভাব ছিল না আর অর্থ ব্যয় করতেও তিনি কখনও কুণ্ঠিত হ'তেন না। প্রতিদিন বিছানা হ'তে উঠেই আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং একটা বজেট (Budget) তৈয়ারী করে ফেলতেন আয়ের নয় শুধু ব্যয়ের। বাস্ এইটুকু ছিল তাঁর একমাত্র কাজ যে টুকু তিনি নিজের হাতে করতেন।

রাম রাম বাবুর স্বভাবটিও ছিল অদ্ভুত রকমের। খরচ তিনি অকাতরে করতেন; কিন্তু পাওনা গণ্ডা কোনদিনের জন্য আদায় করতে ভুলতেন না এবং প্রাপ্য একটি সিকি পয়সাও

তিনি কখনও কাউকে উশুল দিতেন না—এতে কারও ভিটে মাটি উচ্ছন্নে যা'ক কিম্বা থাক। অবশ্য এ বিষয়ে কোনদিন কোন যুক্তি তাঁর কাছ হ'তে শুনি নাই তবে তিনি মাত্র এইটুকু বলতেন যে 'বাবা, যা পায় তা দাও যা পাবে তা নাও। ও সব কাটান ছিটান হিসাব বুঝি না, বুঝবোও না।' সংসারে তাঁর আপনার জন কেউ ছিল না, তবে স্থায়ী পোষ্য ছিল অনেক—অস্থায়ী পঞ্চকের তো কথাই নাই। প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটি, সদর মফঃস্বল দুইভাগে বিভক্ত; কিন্তু সদরেও তিনি মফঃস্বলেও তিনি। একটি বিশেষ ক্ষমতা তাঁর এই ছিল যে একাই একশত হয়ে থাকতেন। তিনি বাড়ী থাকলে সদর মফঃস্বল দুইই একসঙ্গে গুলজার থাকতো। তাঁর ভাব গতিক দেখে মনে হোত যে তিনিই বুঝি দ্বাপর যুগে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়ে ষোড়শশত গোপীনীর সঙ্গে একই সময়ে বিরাজ করতেন, আর এখন কলিযুগে সব জিনিষের বহর খাট হয়েছে বলেই হয়তো তাঁর কেরামতিটা ও অপেক্ষাকৃত খাট হয়েছে। অন্দরের লোক তাঁদের শুভাগমন অবশ্য সন্ধ্যা হ'তেই আরম্ভ হোত। অন্দরে উপস্থিত হয়ে খবর পাঠালেই মত্ত প্রাণে তিনি অন্দরে হাজির—গল্প গুজব হাসি ঠাট্টায় অন্দর মহল মুখরিত আবার বহির্বাটীতে অভ্যাগত এলে তখনই নির্বিকার চিত্তে সেইখানে উপস্থিত—সেখানেও গালভরা হাসি প্রাণখোলা কথা। এত

রকমের এতলোক তার কাছে যাতায়াত করতো যে আমি একদিনও শুধু পুরান লোকে বাড়ী ভর্ত্তি দেখি নাই। চির নূতন চিরপুরাতন তার আসর দিনরাত মজগুল রাখতো।

আমি তারই অর্থানুকূল্যে বি, এল, পরীক্ষায় পাশ করে শেষে তাঁরই প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়েছিলুম। আমার উপর তাঁর বিশ্বাসও ছিল অগাধ আর আমিও তাঁর কাজ প্রাণ দিয়ে করতুম। তাঁর বিশাল জমিদারীর মধ্যেই আমাদের সবুজমাটী গ্রাম। যখন প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার তাড়নে আমাদের গ্রামখানি গ্রাম্য তালিকা হ'তে খসে নেবার চেষ্টায় সচেষ্ট তখন অবশ্য আমারই আবেদনে রামরাম বাবু ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার ইচ্ছায় গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়, বিনা দর্শনীতে এম, বি, ডাক্তারের সাহায্য, গ্রাম্য এঁদো পচা পুষ্করিণীর সংস্কার, বন জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি ব্যবস্থা করবার জন্য ঔষধ ডাক্তার সুপথ্যের উপাদান ও টাকা সঙ্গে দিয়ে আমায় পাঠালেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন যে সেখানকার গোমস্তার কাছে হিসাব নিকাশ মতে সমস্ত টাকা বুঝে নিতে এবং আরও বলে দিলেন যে সে টাকা তার কলকাতার দপ্তরে পাঠাবার কোন প্রয়োজন নাই সে টাকাও ইচ্ছামত সংস্কার কার্য্যে ব্যয় করতে পারি। শেষে খুব ভাল করে বলে দিলেন যে প্রতি পাই পয়সার হিসাব যেন আমি রাখি নতুবা তার জন্যে আমায় দায়ী হ'তে হ'বে। সুতরাং

খাতা নিয়েই আমাকে গ্রামে আসতে হয়েছিল। দেখতে দেখতে গ্রামে একটি সুবৃহৎ ডাক্তারখানা বসে গেল, ডাক্তারও কাজে মন দিলেন, আমিও সংস্কারাদির যা কিছু প্রয়োজন মনে করলুম তার একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করে কার্য্যাদি আরম্ভ করে দিলুম। বলা বাহুল্য আমরাও বিশেষ সাবধানে, মাঝে মাঝে কুইনাইন সেবনে গরম জল পানে ও ব্যবহারে দিনের পর দিন কাটাতে লাগলুম। কার্য্য সুন্দর ভাবেই চলছিল এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপটা ও অল্পদিনের মধ্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছিল এটাও বোঝা গেল। একদিন কলকাতার চিঠির মধ্যে দেখি বাবুর নিজের হাতের লেখা একখানা পত্র। পত্রের মর্ম্ম ঃ—

(কলিকাতা)

প্রিয় সরোজ,

তোমার যাবার পর অনেকরকম চিঠি পেয়েছি, আর তোমরা সকলে যে মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম করছ তাও নানারকম রিপোর্ট (report) হ'তে বুঝতে পারছি ; কিন্তু গোমস্তার হিসাব নিকাশ নিয়েছ কি না, কত আমাদের প্রাপ্য ও কত পেয়েছ তা কিছুই লেখ নি। হয়তো তাড়াতাড়ি কিম্বা কাজের ভিড়ে এ কথাটা লিখতে মনে নাই ; তা' হ'লেও বোঝা উচিত যে কাজের বড় ছোট কোনটাই নয়—অতএব পত্র পাঠ এ বিষয় আমাকে জানাবে। আর ওখানে খরচের জন্য টাকার আবশ্যকতা আছে কি না তাও লিখবে। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি—

শ্রীরামরাম গুপ্ত।

অদ্ভুত চরিত্রের লোক এই রামরাম বাবু। কিন্তু সে যাই হোক্ এতদিনের মধ্যে গোমস্তার কাছে কোন রকম হিসাব পত্র তো আমার নেওয়া হয় নি। আমি যে হিসাব নেবার চেষ্টা করিনি তা নয়; কিন্তু যতবার ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে গোমস্তার বাড়ী গেছি ততবার অমনি অমনি ফিরে এসেছি; কারণ তার একটি মাত্র পুত্র ও জামাতা ভদ্রলোককে কপর্দ্দক শূন্য করে' অর্থ ও যত্নের, ঔষধ ও পথ্যের গণ্ডী অতিক্রান্ত হয়ে' ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে। গোমস্তাও কিয়দ্দিন যাবৎ পত্নী সহ শয্যাশায়ী। একদিনের গ্রামবাসী আজ কপালদোষে ভিটে মাটি হীন প্রবাসী হয়েও এমত অবস্থায় গোমস্তার হিসাব নিকাশ আমি নিতে পারি নাই এমন কি টাকার কথাও উত্থাপনে সমর্থ হই নাই। সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের দ্বন্দ্ব দাসজীবনের বিবেকে স্থান পায় কেন কে জানে। অনেক দিন খাতা সঙ্গে নিয়ে গোমস্তার বাড়ী পর্য্যন্ত যাওয়া করেও কার্য্যতঃ কিছুই করে উঠতে পারি নাই। বাবুর মেজাজ আমার সবিশেষ জানা ছিল। তাই আজ তাঁর এই পত্র পেয়ে সত্যই ক্ষুব্ধ ও ভীত হলুম। তাঁকে তো কোন মতেই বোঝাতে পারব না যে আমি আমার কর্ত্তব্য পালনের সমস্ত চেষ্টা করেছি, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে সময়ের ফেরে আমিও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয়েছি আর আমাদের গোমস্তারও অর্থনাশ মনস্তাপ ঘটেছে। একদিন ভেবেছিলুম এই কৈফিয়ৎ

দিয়েই বাবুকে চিঠি লিখবো, লিখতেও বসেছিলুম; কিন্তু হায় মোহ আমায় বাধা দিয়েছিল। একই সঙ্গে স্ত্রী পুরুষের কাতরতা, তাদের বুকজোড়া ব্যথা আর মর্ম্মস্পর্শী ব্যাকুলতা আমায় বাধা দিয়েছিল। তাই কোন রকমে এতদিন চাপা দিয়েই রেখেছিলুম, কিন্তু তখন ভাবি নাই যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা আমাদের বাবুর কাছে কিছুতেই চলবে না। হা অদৃষ্ট!

যাই হোক্ পত্রখানা হাতে করে' অন্য কাজ সিকেয় তুলে আমাদের গোমস্তার বাড়ীপানে রওনা হলুম। বাড়ীর পাশে আসতেই দরজার বাইরে নিরাভরণা জীর্ণাশীর্ণা শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা কিশোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তেই বুদ্ধিমতি বুঝতে পারলে যে টাকার তাগিদায় এই অসময়ে আমার আবির্ভাব। আর তার সাক্ষ্য ও ছিল আমার সঙ্গের চাপরাশীর হাতে বড় বড় আকারের খাতার গোছা। কিশোরী আমার কথার অপেক্ষা না করে প্রথম সম্ভাষণেই বললে "কি সরোজ দা, তুমিও এই দুঃসময়ে শত্রুতা করতে এসেছ? বাবা মা মৃত্যুশয্যায় আমি একাকী রাস্তায় ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়েছি আর তুমি এই অসময়ে একরাশ খাতা নিয়ে আমাদের শাসাতে এসেছ? সরোজদা, এই কি তোমার লেখা পড়া শিখবার ফল?" বিস্ময় বহির্ভূত জীব আমি তাই কিশোরীর কথায় চোখ মুখের ভাব বদলিয়ে গেল না কিন্তু যাইহোক্ একটা কিছু ব'— কথার জবাব তো দিতে হ'বে তাই বড়দর্শনের নজির খুঁজতে ব্যস্ত

এমন সময়ে কিশোরী আবার ব'ললে "সরোজদা, টাকা আমরা দেব ঠিক্, আর টাকা টাকা করেই বাবা শরীর নষ্ট করতে বসছেন, করেছেন ও কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমাদের যে কিছুতেই কিছু হোল না। দুর্ভাবনায় বাবা শেষে এই বিষম ব্যাধি ডেকে আনলেন, মাও রোগে শোকে যেতে বসেছেন। সরোজদা, ভগবান করুন, বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর বাড়ী ঘর দোর বেচেও তোমাদের টাকার ব্যবস্থা করবেন তিনি। দুই চার দিন ধৈর্য্য কি জমিদারের সইবে না?" "কিশোরী, জমিদার ২।৪ দিন কেন ২।৪ বছর সবুর করতে পারেন, কিন্তু আমি চাকর আমার তো একটা কর্ত্তব্য আছে।" "কি কর্ত্তব্য, সরোজদা? সীমাহীন সুগভীর মরণ সমুদ্রের বুকে ভাসছে, এক একটি ঢেউ এর সজোর মমতাহীন ঘাত প্রতিঘাত বক্ষ পঞ্জর ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে যার সেই মানুষকে তুমি ক্ষমতাবান বলে জলের তলে ডুবিয়ে ধরতে আসা, আর্থিক সমস্যায় পরমার্থিক পদার্থকে জাহান্নমে দেওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য? বড় চমৎকার তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান সরোজদা। স্বদেশবাসী কিনা তাই দেশানুরাগ কর্ত্তব্যানুরাগ বড় চমৎকার।" এবারেও গ্রাম্য বালিকার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে আশ্চর্য্যান্বিত না হয়ে শুধু মুগ্ধই হলুম; কেন না পণ্ডিত প্রবর পিতার শিক্ষা দীক্ষায় কিশোরীর এরূপ সুশিক্ষিতা না হওয়াই বরং আশ্চর্য্যের বিষয় হোত; তবে মুগ্ধ হওয়ায় আমার কোন হাত ছিল না। আলোকের সম্মুখে সাপের

মাথা নুইয়ে যায়, সংশিক্ষার কাছে শিক্ষার অভিমান নতমুখী হয় এটা চিরন্তন প্রথা থাক্। ঘটনাচক্র সংকল্প ভুলিয়ে দিলে আর Sentiment অমনি আমায় বলালে 'কিশোরী, হিসাব থাক্, চল তোমার বাপ মা কেমন আছেন দেখি।' "তোমায়' ধন্যবাদ সরোজ দা; কিন্তু তোমার যাবার কোন প্রয়োজন দেখিনা। কিশোরীর এমন শিক্ষা আছে যার দ্বারা সে তার কর্ত্তব্য খুঁজে নিতে পারে আর সে কর্ত্তব্য অবিচলিত চিত্তে সম্পাদন করতে ও পারে। যাও সরোজ দা, তোমার দয়ায় কাজ নাই।" কিশোরীর এই গর্ব্বিত উক্তিতে সত্যই ব্যথা অনুভব করলুম আর সেই ব্যথিত হৃদয়ের ভার লাঘবের জন্যই বললুম "কিশোরী. গর্ব্বিত রমণীর কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকলেও সে জ্ঞান লুপ্ত হ'তে বেশী সময় লাগে না।" আমার কথায় উত্যক্ত ফনিণীর মত সে একবার গর্জ্জে উঠেছিল কিন্তু কি জানি কি ভেবে সেই মূহুর্ত্তেই বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরভাবে সজল নয়নে গৃহাভ্যন্তরে গেল। তখনই আমার মনে হোল কিশোরী যে ডাক্তারের খোজে বেরিয়েছিল। হায় পাপিষ্ঠ আমি, সেই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমিই বাধা দিয়েছি। কিন্তু 'হা পাপিষ্ঠ ততোধিক' কথাটা তখনই রামরাম বাবুর উপর প্রয়োগ করলুম কেন না তাঁরই কার্য্য আজ আমায় এক যুবতীর কাছে হৃদয়হীন্ জ্ঞানহীন্ পশুবৎ চিত্রে চিত্রিত করেছে। মানুষ সাধ্যভর দোষ নিজের ঘাড়ে নেবেনা তো—এই তার চরিত্র। আর এই চরিত্রই বুঝি এই

দুনিয়ার অকল্যাণ গণ্ডায় গণ্ডায় সাধন করেছে, কিন্তু কেমন মজা 'বোঝালে বোঝেনা বুঝিতে চাহে না শিং নেড়ে শুধু গুঁতোতে যায়'। মনে হয় মানুষ তৈয়ারী করবার একটা কারখানা আছে আর সেটা ঠিক্ আজকালকার আমাদের এই সব কল কারখানার মতই অবিকল। ইঞ্জিন তৈয়ারী হ'বে, তার পঞ্চাশটা অংশ কারখানার মধ্যেই পঞ্চাশটা বিভিন্ন মিস্ত্রীর দ্বারা পঞ্চাশ জায়গা হ'তে তৈয়ারী হয়ে একজনের নিকট এল। সে দেখলে, হাঁ তার শিক্ষায় উপদেশ মতে ও আয়োজনে—কারণ সেই হচ্ছে প্রধান শিল্পী কি না—সমস্ত অংশগুলি ঠিক্ ঠাক্ তৈয়ার; জোড়া তাড়া হয়ে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশগুলি সম্পূর্ণ ইঞ্জিনে পরিবর্ত্তিত হোল বাকী রইলো শুধু কার্য্যকরী ক্ষমতা তার মধ্যে দিতে, যার জোড়ে সে চলা ফেরা করবে। খোদ কারিকর তখনই সেটা দিয়ে বললে বাস্ নিয়ে যাও ঠিক্ হয়েছে; কিন্তু এত সময় কম তার যে যাকে নিয়ে যেতে বললে সে যে ঠিক্ নিয়ে যাবে এবং বরাবর তারই উপদেশ মত একই ভাবে রাখবে তা ভাবলেও না দেখলেও না কারণ তার মনে হোল যে এ ঠিক্ পারবে কেন না এ তো তারই চেলা কিন্তু ভুলেও একটীবার মনে হোল না যে তার তথাকথিত উদ্ভাবনী শক্তি আছে কি না, বাহাদুরী নেবার ইচ্ছা হ'বে কি না? হায় ছেলে যে বাপের চেয়ে পণ্ডিত হয়েছে, শিষ্য যে গুরুর উপর চাল চালতে শিখেছে

তা কি বাপ কিম্বা গুরু কখনও ভাবতে পারে? তাই বলছিলুম যে এই একই শিল্পী নির্ম্মিত এই মানুষ গুলো দেখতে শুনতে, চলতে ফিরতে ও মূলে এক হ'লেও তাদের গুরুমারা বিদ্যার প্রভাবে একেবারে বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই জন্যই আজ রামরাম বাবু ও আমি কিশোরী ও তাঁর মরণাপন্ন জনক জননী সব একেবারে বিভিন্ন। সৃষ্টিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব আলোচনায় সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে জ্ঞানের অগোচরে কখন যে ভূম্যাসন্ গ্রহণ করেছিলুম তা বুঝতে পারলুম ঠিক্ তখনই যখন চাপরাশী 'বাবুসাব্' বলে আমার ধ্যান ভঙ্গ করলে। তার কথায় জ্ঞান ফিরে এল, কি করা উচিত তাও ঠাওর করে নিলুম। পাঁড়েজীকে তখনই ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে কিশোরীদের বাড়ী আসতে বলে দিলুম। পাঁড়েজী চলে গেল আমিও ভাল মন্দ না ভেবে কিশোরীদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলুম। প্রবিষ্ট হয়েই দেখি রোগক্লিষ্ট বেদনাহত পিতার বুকে মুখ রেখে অজস্রধারে কাঁদছে আর নির্ব্বাক পিতা মাঝে মাঝে তার কম্পিত দুর্ব্বল হস্ত সঞ্চালনে কন্যার পাণ্ডুর মুখের উপর পতিত অশ্রুধারা মুছাবার বৃথা চেষ্টা করছেন। বিচলিত হওয়া আমার স্বভাব নয় তাই স্থির ভাবে প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়েই এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম। পাষাণ স্তূপের মত আমাকে সম্মুখে দেখেই কিশোরীর পিতার রক্তহীন্ মুখ মৃত্যু মলিনতায় ম্লান হয়ে উঠলো পলকের মধ্যে তার হস্ত পদ অবশ

হয়ে এল। পরক্ষণেই দেখলুম রামরাম বাবুর সবুজমাটির গোমস্তা তার ইহজন্মের হিসাব নিকাশ শোধ করে হিসাবহীন দেশে চলে গেল—পিছনে পড়ে রইল শুধু তার হিমাঙ্গ অসাড় দেহ, পলকহীন চক্ষু আর তার কোণে শিশির বিন্দুর মত দুটী ফোঁটা অশ্রু। এ সব পার্থিব তাই বুঝি এ পারেই রয়ে গেল। পিতার অবস্থা কিশোরী বুঝতে পেরে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠ্‌লো, কিন্তু তখন তার পিতা, হায়রে অদৃষ্ট, দূরে বহু দূরে, উর্দ্ধে বহু উর্দ্ধে। কিশোরীর রোদন রোল অদূরে মৃত্যুশয্যাশায়িনী ক্ষীণাঙ্গী গৃহিণীর কাণেও পৌঁছুলো তাই বুঝি তিনি দারুণ উৎকণ্ঠায়, প্রাণের তাড়নায় শয্যা পরিত্যাগ করে উঠবার চেষ্টা করলেন কিন্তু শক্তিহীনা চেষ্টা ব্যর্থ হোল! তখন তাঁর মুখ চোখ নাক কাণ বেয়ে দরদরধারে রক্ত-প্রবাহ ছুটছে দেখলুম। সহায়হীনা কিশোরী তাই মৃত পিতার শয্যা পরিত্যাগ করে জননীর সস্নেহ কোমল ক্রোড়কে স্থির নিশ্চয় আশ্রয় স্থল ভেবে সেইখানে এসেপড়লো। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল 'মাগো কি হোল গো বাবা আমার নাই'! চোখ বুজে এল, আমি আঙ্গিনায় বসে পরলুম। ক্ষণপরে চোখ খুলতেই দেখলুম মাতা-ও পুত্রী পরস্পরে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ, বাক্যহীন, নিশ্চল। ভীতি বিহ্বল চক্ষে উর্দ্ধে চাইলুম, বড় আশা যদি শক্তিমানের দেশ হ'তে শক্তি প্রবাহ নেমে আসে। করুণাধারা বর্ষণের আশায় সমস্ত প্রাণের যাবতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা জোর করে জাগিয়ে তাঁর দিকে তুলে

ধরলুম, কি বিড়ম্বনা; কোন সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত পেলুম না। উন্নত চক্ষু আনত করতেই দেখতে পেলুম ডাক্তার বাবু ও আমাদের পাঁড়েজি।

*   *   *   *

এক বৎসর কেটে গেছে। আমি কিশোরীকে সঙ্গেনিয়ে পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে এসেছি—ওগো এসেছি আমার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। ইতিমধ্যে গ্রামে নানা জনে নানা কথা রটিয়ে ব্যাপারটাকে বেশ রঙ্গীন্ করে তুলেছিল আর রংচং করা কথা বাতাসের গায়ে গা দিয়ে কলকাতার রামরাম বাবুর কাণেও উঠেছিল। তাঁর টিকাটিপ্পনী আমার কর্ণগোচর হয় নাই সত্য কাজেই বিশ্বাস করেছিলেন কিনা তা ঠিক বলতে পারি না তবে অবিশ্বাস করবার মত চরিত্রও তাঁর ছিল না। যা'হোক্ কাশীধামে এসেই সবুজমাটির সমস্ত হিসাব নিকাশ রামরাম বাবুর কাছে আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলুম আর কিশোরীদের নিকট যে টাকা হ'বে তার ও একটা মোটামুটি হিসাব পাঠিয়ে লিখেছিলুম যে এটাকা তাঁকে আমিই দেব। অবশ্য তাঁর কাছ হ'তে আজ পর্য্যন্ত কোন রকম জবাব কিছু পাই নাই।

কিশোরী প্রথমতঃ আমার অভিপ্রায়ে সন্দিগ্ধ হয়ে সন্দিগ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক—আমার প্রদত্ত জলস্পর্শ করবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু যখন আমি তাকেবুঝিয়ে দিলুম আর যখন সে বুঝিলে

সরোজদা সত্য সত্যই তার স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বারাণসীধামে এসেছে, তার যুবক সরোজদা যুবতী কিশোরীর নভেলের নায়ক নায়িকার মুখ বন্ধের 'দা' নয়, সতই সে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতই একজন অকৃত্রিম জ্যেষ্ঠ সহোদর, যখন সে বুঝলে তাদের এই প্রীতি "ভক্ষ্যভক্ষ্যকয়ো প্রীতি বিপত্তেরেব কারণম" নয় তখন সুশিক্ষিতা কিশোরী স্নেহশীলা ভগিনীর মধুর সরল ব্যবহারে আমার নীরস অন্ধকার প্রাণে সরসতার উৎস সৃজন করে আনন্দে আমায় ভরপূর করেছিল। তমসাবৃত জীবনের পিচ্ছিল পথে সোহাগ সুন্দর সুবর্ণরশ্মি প্রতিফলিত করে সুদৃঢ় সুকোমল স্নেহযষ্টির সহায়তায় সে আমার হৃদয় মন পুলকিত করে তুলেছিল। সেদিনের গরিমাময় সুপ্রভাত এখনও আমার মনে আছে। সে দিনের মাধুর্য্য, সে দিনের উল্লাস সে দিনের সার্থকতা মনে হ'লে বেশ বুঝতে পারি বিরাট পুরুষের সৃষ্টি কতই কমনীয়, ভ্রাতা ভগিনীর মিলনানন্দ কতই সুষমামণ্ডিত, বিশ্ব জগৎ কতই উজ্জ্বল।

কাশীধামে কোন উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত থেকে আমি যা উপার্জ্জন করতুম, ঘরে বসে, গঙ্গাস্নানে গিয়ে অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, গরীব দুঃখীদের দান করে কিশোরী এই উপার্জ্জিত অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি করতো। বুদ্ধিমতী চতুরা কিশোরী, বলা বাহুল্য পিতৃঋণ পরিশোধ হেতু এই অর্থের

কিছু কিছু জমিয়েও যেত। এইরূপে আমাদের সুদূর বর্ত্তমান অতীতের কোলে ঢলে পড়েছিল আর নিকট বর্ত্তমান ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলছিল। সেদিন অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। আমি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত এমন সময়ে একখানি স্থানীয় ডাকের পত্র আমার হস্তগত হোল। পত্রখানা কে লিখছে কি লিখছে জানবার একটু কৌতূহল আমার মনে জেগেছিল; কিন্তু বিস্ময় তো আমায় বিচলিত করে না—হয়তো সে ইন্দ্রিয় কার্য্যাক্ষম—তাই কুতূহলের ছাপ পড়বার আগেই মন আমার অতীত কাহিনী স্মরণ করে নির্ব্বিকার পুরুষের পন্থা অবলম্বন করলে। বিস্ময়ে গড়া, একটি অপূর্ব্ব স্মৃতির পর আর একটি অপূর্ব্ব স্মৃতি বসান, কুতূহলের দীপ্তি মাখান জীবন সৌধ, মরম নিংড়ান কীর্ত্তি, দর্শকের কিম্বা শ্রোতার চিত্তবিভ্রমে সমর্থ হয় কিন্তু নিজের মন টলাতে পারে কি? তা হ'লে বিষাদের ছবি অপূর্ব্ব তাজমহল কি আজ দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো? বিস্ময়, আমার জন্মের সাথী, কর্ম্মের সাথী জীবন যাত্রার সহযাত্রী। মাতৃজঠর হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'বার পর যে বিস্ময় আমার চোখ খুলে দিলে সেই বিস্ময় আজ পর্য্যন্ত আমার প্রতি পাদপক্ষের সঙ্গ লুটিয়ে চলছে আর আমরণ তাই চলবে। জন্মালুম সেইতো একটা বিষম বিস্ময়। তারপর জ্ঞান হ'তেই জানলুম যে মাটিতে পড়বার মাত্রই জননী আমার স্বর্গা-

রোহণ করেছেন—পিতা, দুর্ভাগ্য আমার জন্মাবার একমাস পূর্ব্বেই অমরধামে চলে গেছেন। সংসারে আমার কেউ ছিল না; ছিল শুধু পুরাণ বিশ্বাসী ভৃত্য হরিদাস, সেও আমার জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গেসঙ্গেই বিস্ময়ের উপর বিস্ময় সৃজনা করে মানবলীলা সংবরণ করলে। তারপর বিস্ময়ের ভিতর দিয়েই রামরাম বাবুর আশ্রয়ে এসে লেখা পড়া শেষ করে নায়েবিগিরি সুরু করেছিলুম। শেষে বিষম বিস্ময়ের মাঝে দিশে হারা হয়ে কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে এই পুণ্যপীঠ কাশীধামে এসেছি। একটানা বিস্ময় দিবারাত্র আমায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তাই বিস্ময়কর ব্যাপারে আমার মন টলে না, হৃদয় গুরু গুরু করেনা, হাত পা অসাড় হয়ে আসে না।

যাইহোক পত্রখানা পড়ে' দেখলুম যে রামরাম বাবু কাশী বেড়াতে এসেছেন, আমায় একবার দেখতে চান। তাঁর বন্ধু ক্যানটনমেণ্টের (Cantonment) বড় ডাক্তার নিখিল বাবুর বাড়ী গেলেই দেখা হবে। উদ্দেশ্য কি কিছু লেখেন নাই। তাই ভাবলুম এ কি টাকার তাগাদা! অধ্যাপনার কাজে আর মন দিতে পারলুম না, আর ছেলেরা ও সুবিধা পেয়ে ইতি মধ্যে বেশ মিহি ও মোলায়েম সুরে গল্প গুজব আরম্ভ করেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে কি জানি ছেলেদের সব ছুটি দিয়ে দিলুম। প্রসন্ন চিত্তে নূতন মাষ্টারের জয়গান করতে করতে তারাও বাড়ী চলে গেল। আমিও

স্কুল হ'তে বের হ'ব ভেবে বারান্দা বেয়ে সিঁড়িতে পা দিয়েছি অমনি হেডমাষ্টার মশায় পিছন হ'তে ডাক দিলেন। বিরক্ত হয়েই বললুম "কি প্রয়োজন শীঘ্র বলুন, আমার একটা জরুরী কাজ আছে।" ঠিক বুঝতে পারি নাই তখন তবে শেষে শুনেছিলুম সে স্বরটা নাকি আমার একটু কর্কশ হয়েছিল। হেডমাষ্টার, উপরওয়ালা, খুব চটে উঠেই বললেন "মশায় ছেলেদের বেলা ছটোর সময়ে যে ছুটি দিলেন তার কারণ জানতে পারি কি?" কারণ দর্শাবার ইচ্ছা ও ছিল না আর উচিত কারণ যে কিছু আছে তাও বিশেষ মনে এল না তাই আর কোনরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর না করেই সটান্ রাস্তায় নেমে পড়লুম। শুধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে নিজের মনেই বললুম "ছুটি দিয়েছি আর উপায় কি।" পরদিনেই শুনলুম যে শিক্ষক প্রবর আমার এই ব্যবহারে বিশেষ রাগান্বিত হয়ে আমায় তৎদণ্ডেই কর্ম্মচ্যুত করেন। বিস্মিত হ'বার আর কি আছে?

সটান রাস্তা বেয়ে যখন আমি আমাদের ক্ষুদ্র ঘরখানির দরজার কাছে এসে গতানুগতিক ভাবে কড়া নাড়ায় ব্যস্ত তখন আমাদের বর্ষীয়সী ঝি এসে দরজা খুলেই কিশোরীর যে বড় ব্যারাম সে সংবাদ দিতে একটুও দেরী করলে না। বিস্ময় অমায় টলাতে পারে না তাই সময় বুঝে সে ভয়কে ডাকলে। অমনি জবরদারের পালের সর্দ্দার এসে জুটলেন। নিমিষের মধ্যে

চোখ মুখ সব লাল হয়ে উঠলো, হাত পা ও কাঁপতে লাগলো আর কদাকার বাতাস কোথায় ছিল জানিনা। সময় বুঝে ঝাঁ করে এসে মাথার চুল গুলোকে উস্কো খুস্কো আর গায়ের চুল গুলোকে দাঁড করিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে এসে দেখি কিশোরী অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিতা। মনে হোল যেন চেতনা লুপ্ত। কপালে হাত দিতেই মনে হোল বুঝি ভ্রমক্রমে হাত খানটা তপ্ত অঙ্গারের উপর রেখেছি। হাতের নাড়ী পরীক্ষা করবার ইচ্ছায় কিশোরীর বাম হস্তখানি তুলে ধরে ঘড়ির সাহায্যে নাড়ীর কম্পন অনুভব করবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু যা দেখলুম—যদিও আমি ডাক্তার নয়, তথাপি বেশ বুঝলুম যে নাড়ীর অবস্থা অতি শোচনীয়। কি করবো না করবো ভাবছি এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ঝি এসে খবর দিলে যে দুজন বাবু বাইরে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মটর গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন। ভীত হৃদয়ের মাঝে একবার যেন চঞ্চল লহর উঠলো কিন্তু ছড়িয়ে পরলো না। উদ্বেগ ও আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হোল, কিন্তু বারিপাত হোল না। ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ইন্দ্রিয়ের সকলদ্বার রুদ্ধ করে যেমন বসেছিলুম তেমনই রইলুম। চঞ্চলতা উদ্বেগ আশঙ্কা দূরে গেল তখন যখন দেখি আমার দয়ার সাগর পুরাতন মনিব রামরাম বাবু ও তাঁর বন্ধু নিখিল বাবু আমার বিনা আহ্বানে গৃহমধ্যে এসে রোগিণীর সেবায় যত্নবান। হায়রে, যে সাগর তার স্নেহসলিল দিয়ে সারাটি পৃথিবীকে ঘেরলাম ম

বেষ্টন করে থাকে আর প্রতিনিয়ত নিজের বুক খালি করে তার পানীয় জলে আহার্য্য বস্তু উৎপাদনের সম্পূর্ণ সহায়তা করে সে যে একদিন তার বিশ্বগ্রাসী দানবের ক্ষুধা নিয়ে সেই পৃথিবীটিকে গ্রাস করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না তাকি পৃথিবী ভেবে নিতে পারে? পারে না, পারলে সাহায্য নেওয়া তো দূরের কথা সে তার কাছ ঘেঁসাও হোতনা। আশা শুধু আশাই যার উপজীবিকা, আশাই যার একমাত্র অবলম্বন একমাত্র অধিকারের বস্তু সেই আশাদগ্ধ জীবের ভবিষ্যৎ কেউ জানে না, হয়তো তার সৃষ্টিকর্ত্তাও না।

নিখিল বাবু খুব বড় ডাক্তার, তাঁর পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। লোকে সাধ্য সাধনা করে' পয়সা দিয়েও যাঁকে পায়না আমি ঘরে বসে বিনা আয়োজনে তাঁর সাহায্য লাভ করেছি দেখে আমার ভয়ের মাঝেও ভরসা হোল। মনে মনে ভাবলুম বাবা বিশ্বেশ্বর তুমিই রক্ষাকর্ত্তা। তবু এ সহজ সরল কথাটা মনে এল না যে মানুষ নিজেকে নিজে রক্ষা না করলে বিশ্বেশ্বর কি করবে। রক্ষা করবার যা কিছু প্রয়োজন সে সকলগুলি দিয়েই তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাজ তিনি করেছেন তবে এ অন্যায় আব্দার আবার কেন? ব'লবে মন বোঝে না; কি করি। বেশ মনকে নিয়ে ঘোঁট পাকাও, সময় ও যাক্। ফল হোল কি তোমার কর্ত্তব্য তুমি করলে না তাঁকেও তার কর্ত্তব্যে বাধা দিলে৮

তোমার একুল ওকুল ছুকুলই গেল। শেষে দোষ দিলে তাঁরই। ধন্য তুমি, স্রষ্টার সৃষ্টি লোপ প্রাপ্ত হয় বুঝি এমনি করেই!

নিখিল বাবুর যত্নে, ঔষধও পথ্যের গুনে কিশোরী শীঘ্রই রোগমুক্ত হয়েছিল কিন্তু তিনি বললেন যে কলকাতায় গিয়ে একবার X Ray (রঞ্জন রশ্মি) সাহায্যে সমস্ত শরীরের বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যক, কেন না তাঁর মনে হয় কোনরূপ Shock পেয়ে কিশোরীর শরীর মধ্যস্থ কোন যন্ত্র বিকৃত ও স্থানচ্যুত হয়েছে এবং সেটার ব্যবস্থা শীঘ্র না করলে এরপর একটা কঠিন রোগে দাঁড়াবে। বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন রামরাম বাবু কি জানি কেন পুনরায় আমায় তাঁর কর্য্যে ব্রতী করে কিশোরীকে নিয়ে কলকাতা আসবার প্রস্তাব করলেন। কিশোরী প্রথমে অনেক রকম আপত্য করেছিল কিন্তু রামরাম বাবুর বিনীত, সময়োচিত ও যথোচিত বাক্যবিন্যাসে কিশোরীর সাধ্য হোল না যে তাঁর প্রস্তাবে অস্বীকৃতা হয়। এই বাগেন্দ্রিয় সময়ে আমাদের কত আপনার আবার সময়ে কত পর। সবই অদৃষ্টের পরিহাস।

বলা বাহুল্য কলকাতায় এসে রামরাম বাবুর ত্রিতল বাটীতে আবার অড্ডা গেরেছি। এবার অন্দর মহলেই কিশোরীর পার্শ্বের একটি প্রকোষ্ঠে—আমার জায়গা হয়েছিল। এখানে এসেই রামরাম বাবু বড় বড় সাহেব ডাক্তার দিয়ে রঞ্জনরশ্মি দ্বারা কিশোরীর পরীক্ষা করিয়ে ঔষধ পথ্যের সুব্যবস্থা করেছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই নীরোগী কিশোরী স্বাস্থসম্পন্না হয়ে উঠলো। চক্ষুষ্মান্ যারা তারা এই যোগ ভ্রষ্টা ব্রহ্মচারিণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রাণ স্বরূপিনী জগন্মাতার মূর্ত্তিদর্শনে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাদের মাথা দেবীর সম্মুখে নুইয়ে দিলে আর অন্ধ যারা তারা রক্তমাংসের দেহ শুধু বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির একমাত্র স্থল ভেবে মোহ মদিরায় উন্মত্ত হয়ে উঠ্লো। নয়ন, অমৃতের প্রস্রবণ সৃজন কিম্বা গরল নিষ্কাষন্ করতে তুমিই ভাল জান। আশ্চর্য্য তোমার ধারা, ও তোমার দৃষ্টিভঙ্গি।

একদিন একখানা প্রয়োজনীয় দলিল খুঁজবার জন্য আমার শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হয়ে নিবিষ্ট চিত্তে আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি খুঁজতে আরম্ভ করেছি এমন সময়ে কিশোরী এসে আমায় ডাকতেই আমি চমকিয়ে উঠলুম। আমায় চমকাতে দেখে কিশোরী বললে "সরোজ দা, তোমার বিয়ের কথা হ'তেই এত অন্য মনস্ক, বিয়ে হ'লে তো দেখছি মন তোমার থাকবেই না।" আমি হাসতে হাসতেই বললুম "কিশোরী, আমার বিয়ের সব বন্দোবস্ত ঠিক হচ্ছে নয়? তাইতো বোনটি, কোথাকার কে এসে সব গুলোট্ পালোট্ না করে দিলে বাঁচি।" "সরোজ দা, তোমার মনের উপর কালির দাগ কেউ দিতে পারবে না, এ আমি বেশ জোর করে বলতে পারি।" "বেশ, তা হ'লেই ভাল।" সরোজ দা অনেক দিনের সাধ যে তোমার একটি ভাল দেখে বৌ নিয়ে এসে

তোমাকে পুরো সংসারী করি। এইবার সে সাধ মিটবে। তারপর দাদাভাই, লক্ষ্মিটি আমার, আমায় আবার কাশী পাঠিয়ে দেবে কেমন?" "আচ্ছা আজ দিন কতকধরে' শুধু কাশী যাব যাব করছো কেন বল তো?" "ভাইটি আমার, পরের বাড়ী কি বেশীদিন থাকা ভাল দেখায়, আর লোকেই বা কি ব'লবে?" একটি দীর্ঘনিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে কিশোরীর নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে গেল। কত কথা, কতব্যথা যে তার সেই একটি নিশ্বাসের বুকে ছিল তা শুধু কিশোরীই জানতো—মূর্খ আমি একদিন ও কিছু বুঝবার চেষ্টা করি নাই, জানবার ধার ধারি নাই। মনে ভাবলুম ব্যথার কারণ জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু আবার কি ভেবে চুপ করে রইলুম। নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠে ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই চিন্তাক্লিষ্ট, বেদনা হত; কিন্তু কার ব্যথা কোনখানে পরস্পরে কেউ বুঝবে না। যা হোক্ নিস্তব্দতা ভঙ্গ করে আমিই বললুম "কিশোরী, কোথাকার অজানা অচেনা এসে আমার কাঁধে চড়বে না আমাকে দেখা শোনা করে পরিচিত হ'বার অবসর দেবে?" "তুমি কি সাহেব সরোজ দা? কিন্তু যা'ক্ সে কথা, "এই দেখ"—কিশোরীর হাতে দেখলুম একখানা গীতাঞ্জলি—"এই মাত্র পড়ছিলুম যে 'কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাই, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই'। এই দেখ সরোজ দা এই দেশ পূজ্য কবি সম্রাট করে যে [illegible]

বসে বিভোর প্রাণে বলে গেছেন ; কিন্তু কথাটা সকলের প্রাণে কেমন পরদায় পরদায় মিশে যাচ্ছে দেখ। এই দেখনা যাঁদের জানতুম যাঁরা বড় আপনার ছিল আজ তাঁরা কোথায় আর যাদের জানতুম না পর বলে ভয় হোত সেই তুমি আমার সহোদরের বেশী হয়েছ, জেঠা মশায় (রামরাম বাবুকে আজকাল কিশোরী জেঠামশায় বলতো) তিনি কত উপকার করলেন। আবার এসংসার কাকে রেখে কাকে পরিত্যাগ করবে এ একটা ভারি সমস্যা। সরোজ দা, আমার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছ কি ? এ সমস্যার উত্তর কোথাও পাবে না। বড় বড় শাস্ত্র উল্টাও, বেদবিধিউপনিষদ, পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র সব আঁতিপাতি করে খোঁজ কেউ তোমার কথার সাড়া দেবেনা। শুধু নিজেদের পাণ্ডিত্য হেঁয়ালীর পর হেঁয়ালী যুক্তির পর যুক্তি ; কত অযুক্তিকে রংফলাও করে মনগড়া কথার ভাঁজে যুক্তিতে দাঁড় করিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই কিন্তু তবুও মীমাসা হয় নাই, কথনও হ'বেনা সরোজ দা। দর্শনে আর বিজ্ঞানে শুধু পৃথিবীটাকে নষ্ট করছে আর করবে ও। বিশ্বাস যে জিনিস কত অমূল্য—সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে, সুসংস্কার ভুলিয়ে দিচ্ছে, অভ্যাস নষ্ট করে দিচ্ছে। গড়বার শক্তি এদের তো মোটেই নাই উপরন্তু শুধু ভাঙ্গতেই চলেছে। একজন উপর থেকে সুন্দর করে গড়ে তুলছে আর একজন নীচে দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য্যের বুক ক্ষত বিক্ষত করে তুলছে।

আবশ্যক, এমনি জিনিষ সরোজ দা, যে সে নিজের প্রতিপত্তি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখতে কোনকালে ইতস্ততঃ করে না। তুমি আবশ্যক না মানতে পার কিন্তু আবশ্যক, তোমাকে মানিয়ে নেবেই। আবশ্যকের মধ্যে আবার সত্য মিথ্যা আছে, সরোজ দা। যদি বল সে কি রকম তা হ'লে সেটা হচ্ছে ঠিক্ এইরকম যে জ্বর থাকতে যে ক্ষুধা পায় সেটা কি আবশ্যক বলে মনে কর? সেটা আবশ্যক নয় সরোজ দা, সেটা একটা মস্ত প্রকাণ্ড রকমের মিথ্যা। তাই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা যেটা আবশ্যক বলে মনে করে সেটাও ঠিক ঐ জ্বরের সময় খাবার ইচ্ছা। প্রয়োজনীয় বলে মনে হোল আর বাড়ীর সকলে কখন অন্যমনস্ক দেখে কিছু খাবার সংগ্রহ করে গলাধঃকরণ করলে কিন্তু ফল যে কি হ'বে তা বুঝলে না, কেন না এটা যে সে আবশ্যকীয় মনে করেছে। কাজেই অমঙ্গল বই মঙ্গল হোল না, হয় তো কোন সময়ে অনিষ্টটা হোল না অমনি বুঝলে যে না ঠিক করেছে সে। বুকের পাটা বেড়ে গেল আর নিজের কীর্ত্তি অক্ষয় অমর করে রাখবার জন্য নানারক ব্যাগবিতণ্ডার অবতারনা করে একখানা লম্বা চওড়া পুঁথি লিখলে শুধু কথার আবোল তাবোল বড় বড় বাক্যের দোহাই, অশ্রুতপূর্ব্ব কথার বাঁধন এইসবে পরিপূর্ণ। তারপর গাছের ডাবটা, পুকুরের মাছটা, আড়ার শাকটা দিয়ে কতকগুলো চেলা যোগাড় করলে— তারা উচ্চৈস্বরে প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করতে লাগলেন। তাই

বলছিলুম সরোজ দা, সত্য আবশ্যক দর্শনে বিজ্ঞানে পাবে না— পাবে তার কাছথেকে যে অন্তরের অন্তস্থলে যেতে পারে, যে প্রাণদিয়ে পরের প্রাণ বুঝতে পারে একটা সত্যের জোরে দশটা সত্যকে উপলব্ধি করে। সে কে সরোজ দা? কবি শুধু কবির কাছেই সত্য পাবে, প্রাণের সত্য আলোড়ন দেখতে পাবে, ভিতরকার সমস্ত কল কব্জাও দেখতে পাবে। তা বলে মনে করোনা দাদাভাই যে তুমি আমি বিয়ের প্রীতি উপহার লেখা কবি, কিম্বা তর্জ্জাওয়ালা এইসব করতে পারে। চোখ চায়, প্রাণ চায়, ইন্দ্রিয়ের সত্য অনুভূতি থাকা চায়, ঈশ্বরকে জানা চায়, মহান সুন্দরকে উপলব্ধি করা চায়। এযে না পারে তার কথার কোন মূল্যনাই— মূল্যহীন জাল নোটের মত তা আবার বিপদ সঙ্কুল। সরোজ দা, তুমি সত্যই অবাক হয়ে গেছ যে এ আবার এত পণ্ডিতি কথা শিখলে কোথা হ'তে আর কেনই বা আজ তার অবতারনা করলে। ভাইটি আমার পণ্ডিত হ'তে হ'লে শাস্ত্র পড়তে হয় না শুধু প্রাণের কেন্দ্র ঠিক্ করতে হয়, অন্তরের সূক্ষ্ম দৃষ্টি সংযত করে ভগবানে নিয়োজিত করতে হয়। আমি যে এসব করেছি তা বলছিনা তবে চেষ্টা করছি। আর আজ এতকথা বলবার উদ্দেশ্য, সরোজ দা, আমি আর একদণ্ডও এ বাড়ীতে থাকতে চাই না; কিন্তু ভাইটি আমার কাছে তুমি মনে কর যে কিশোরী—"। ইতি মধ্যে রাম-রাম বাবু গৃহমধ্যে উপস্থিত হওয়ায় কিশোরীর বক্তৃতায় বাধা

পড়লো। রামরাম বাবুকে দেখে কিশোরী সঙ্কুচিতা হয়ে ঘর হ'তে বেড়িয়ে গেল। সহসা এ সঙ্কোচের কারণ বুঝতে পারলুম না আর ভেবে চিন্তে যে কারণ বের করবো রামরাম বাবু সে উপায় ও রাখলেন না। 'পাকা দেখা' আরে আজ তোমার এখুনি পাকা দেখা, এস, এস" বলেই আমাকে একরকম টানতে টানতেই ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন।

দ্বিতলের মজলিস গৃহে উপস্থিত হয়েই দেখি কয়েকজন মধ্যবয়সী কয়েক জন পরিণত বয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হ'তেই রামরাম বললেন "এই দেখুন নলিনী বাবু, সরোজকে দেখুন।" তারপর যেটুকু আমার সামান্য পরিচয় তাও সঙ্গেসঙ্গে দিতে ভুললেন না। আমিও কার্পেটের ফরাসে বসলুম। তখন চারিদিক হ'তেই আধ আধ স্বরে "খাসা ছেলে, বেশ হবে, ইত্যাদি" মন্তব্য আমার কাণে পৌছুলো। বাস্তবিক আমার বড়লজ্জা বোধ করছিল,তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘাড়টা নুইয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর দেখা শুনো হয়ে গেল আমি ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। যাই হোক্ সর্ব্বসাকল্যে একটা লম্বামত নমস্কারও নয় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও নয় ঐ মাঝামাঝি একরকম করে বিদায় নিলুম। কোথায় যাব, কি করব ভাবছি এমন সময়ে সেই প্রয়োজনীয় দলিলের কথাটা মনে হোল। অমনি অন্দর মহলের দিকে ধাওয়া করলুম কিন্তু কিশোরীর সম্মুখীন হ'লেই পণ্ডিতি কথা আর আজগুবি বক্তৃতা ও সরল তামাসা

শুনতে হ'বে এই ভয়ে এবং লজ্জায় মধ্য রাস্তা হ'তেই ফিরলুম। অন্দরে আর যাওয়া হোলনা; তাই বাগান বেয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে গঙ্গার কূলে বেড়াতে এলুম। আমাদের বাড়ী হতে গঙ্গা দুই তিন মিনিটের রাস্তা, কাজেই বেড়াবার অন্য কোন স্থান ভাবতে না পেয়ে গঙ্গার ধারেই এলুম। বেশ চাঁদ উঠেছিল, ভাবও এসেছিল তাই আপন মনে গঙ্গার ধারেই অনেকক্ষণ বসেছিলুম; কিন্তু পাশের গির্জ্জার ঘড়িতে নয়টা বাজতে শুনে, চমকিয়ে উঠলুম। ভাব ভক্তি উড়ে গেল। খিড়কির দরজা বেয়ে পাশের সিড়ি দিয়ে উপরে ঘড়ে প্রবেশ করব এমন সময়ে কিশোরীর ভীতি কাতর কণ্ঠ আমার কাণে এল। দূর হ'তে দেখলুম কিশোরী যেন কিসের ভয়ে কম্পিত বেতস পত্রের মত তার ঘরের কোনে আর মেজের উপর চেয়ারে রামরাম বাবু। এদৃশ্য চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারলুম না তাই আরও নিকটস্থ হয়ে ভয়ে উৎকণ্ঠায় পাথরের মত একটি থামের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। কি কর্ত্তব্য ভাবছি এমন সময় রামরাম বাবু বললেন "কিশোরী, সরোজের বে হ'বার পরেই ওকে কিছু দিয়ে থুয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দেব, সে কিছুই জানবে না তবে কেন আপত্তি।" কি সর্ব্বনাশ, এই কি সেই আমার দয়ার বারিধি, সরল রামরাম বাবু—এই কি সেই কাশীধামের বিনীত উপযাচক, এই কি সেই হৃদয়বান আশ্রয় দাতা? হায়, হায় সম্ভোগ বাসনা বুঝি দেবতাকে ও কলুষিত করে। ক্ষোভে ও

ঘৃণায় দুঃখে ও লজ্জায় আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। তবু দাঁড়িয়ে রইলুম নারীচরিত্র পরীক্ষার জন্য, কিশোরীর মুখের কথা শোনবার জন্য। কিশোরী কাঁদতে কাঁদতে বললে "জেঠা মশায়, আমি যে আপনার কন্যা, সরোজ যে আপনার পুত্রস্থানীয় আমি যে তার বোন। আমায় কেন এ পাপকথা শোনাচ্ছেন"! "কিসের পাপ! স্ত্রী পুরুষের মিলনে কখনও পাপ নাই, আজও হ'বেনা। "জেঠা মশায়, পিতা পুত্রীর মিলনে পাপ নাই আপনি একি বলছেন?" "কে পিতা, কে পুত্রী?" "বেশ তাই হোল। দয়া করে আমায় বিদায় দিন। আমি এখুনই সরোজদার সঙ্গে অন্যত্র চলে যাই। পাপ কথা আমায় শোনাবেন না। আপনি এখুনি এঘর হ'তে চলে যান।" "কিশোরী এঘর এখনও তোমার নয়, তবে তুমি ইচ্ছা করলেই তা হ'তে পারে।" "জেঠা মশায় আপনার পায়ে ধরি, আপনি সরে যান, আমায় যেতে দিন নইলে আমি চিৎকার করে' আপনার কলঙ্ক কাহিনী লোকের কাছে প্রচার করবো।" "তাইতে রামরাম গুপ্তের বড় বয়েই যাবে। কিশোরী ভাল চাও আমার কথা রাখ নইলে—।" রামরাম বাবুকে চেয়ার ছেড়ে মাংস লোলুপ মার্জ্জারের মত কিশোরীর পানে যেতে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না।' দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রোরুদ্যমানা শঙ্কিত প্রাণা কিশোরীর কাছে গিয়ে রামরাম বাবুকে লক্ষ্য করে বললুম

"বাবু, আপনার একি কাপুরুষের মত নীচ ব্যবহার? আমরা চাই না আপনার দয়া। ভ্রাতা ভগ্নি মিলে এখুনি আপনার বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। যান আপনি সরে যান।" হায়, রামরাম বাবু তখন অন্ধ, চিত্ত তাঁর কলুষিত বিত্ত তাঁর জাগ্রত বাক্য অসংযত, ক্ষমতা অপ্রতিহত তাই আমার কথায় আমার বাধায় রামরাম বাবু চাপরাশি ডাকিয়ে লাঞ্ছিত করে আমায় ঘর হ'তে বের করে দিলেন। অগাধ অর্থ, ততোধিক সামর্থ তাঁর তাই বাড়ীর আর সকলে আমাদের এ নির্য্যাতন্ সাধ্বীর উৎপীড়ন কাহিনী শুনেও শুনলে না। অর্থের কাছে ন্যায় ও সুরুচি সব মাথা হেঁট করে রইলো। আশ্চর্য্য পৃথিবী, আরও আশ্চর্য্য এই মানুষ তার উপরেও আশ্চর্য্য মানুষের উর্ব্বরা মস্তিষ্কের আবিষ্কার এই অর্থ। এই অর্থ খোদার উপর ও খোদকারি চালায়। সাবাসরে অর্থ, সাবাসরে দুনিয়া।

যা'ক, আমি গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত হয়ে রাস্তায় পরলুম না। সে সৌভাগ্য আমার হোলনা তাই রামরাম বাবু নিজেই আমায় নীচে চাকরদের ঘরে তালা বন্ধ করে আটক্ করলেন। বুকের ভিতর যে কি অসহ্য যাতনা ঘূর্ণির মত প্রতিমুহূর্ত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তা মানুষে কেউ জানে না—জানেন শুধু অন্তর্য্যামী; কিন্তু দৈতের উপর তাঁর প্রভাব অল্প তাই বুঝি জেনেও কোন বিহিত করতে পারলেন না। বিষম যাতনায় ক্রোধের তাড়নায়, দারুণ আশঙ্কায়,

বাষ্পাকুল নয়নে, অবসন্ন প্রাণে, ভগবানের স্তুতিগানে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করলুম। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ গৃহের দরজা উদ্ঘাটিত হ'লে দেখতে পেলুম যে কয়েকজন পুলিশের লোক আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলে। বাঃ, বড় সুন্দর ব্যবস্থা! তখনও আমার জ্ঞান টন্ টনে। তাই প্রভাতের আলো বলে দিলে আমায় যে যাও নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও। ভগবান, তোমার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। কেন এ কথা মনে হোল জানিনা। তা জানবার কোন উপায়ও ছিল না কিন্তু এ যে একটা কঠোর সত্য প্রত্যক্ষীভূত না হ'লেও ইন্দ্রিয় অনুভূত হয়েছিল। যাইহোক হাতের লোহার বাঁধন কোমরের কাছি আর দারোগা মহাপ্রভুর রক্ত চক্ষু আমায় থানায় এনে বিচারের ব্যবস্থার জন্য শেষে আদালতে নিয়ে এল। বিচারে আমি চোর সাব্যস্ত হ'য়ে জেলে গেলুম। সুন্দর বিচার প্রণালী, সুন্দর নিয়মাবলী। চুরি করেছ জেলে যাও, ভাবলে চলবে না। ভাবতে হয় জেল হ'তে বেরিয়ে এসে ভাববে। বিধাতার সেরা ও শেষ সৃষ্টি মানুষ, আর মানুষের সেরা ও শেষ সৃষ্টি আইন। বাঃ চমৎকার সৌসাদৃশ্য! তাই বুঝি মানুষকেই সবাই দেবতা বলে। বাঃ কি সুন্দর। আমিও আবার একজন আইনজ্ঞ; আরও সুন্দর, আরও চমৎকার!

জানিনা কতদিন পর, না, না, অন্যায় হোল, ঠিক্ এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের পর—কেন না হাকিম আবার অপরাধীকে

শাস্তির মাত্রা ও সময় বলে দেন, বাঃ, কেমন সুন্দর, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিবার ব্যবস্থা, যখন চোর খালাস পেয়ে সদর রাস্তায় নামলো তখন অপরিচিতেরা পাগল বলে ঠাট্টা করতে লাগলো, পরিচিতেরা সরোজ কুমারের এই দশা হয়েছে বলে অবজ্ঞার হাসি হেসে চলে গেল, আর সুপরিচিতেরা কারাবাসের ব্যবস্থাটা জানবার জন্য উৎসুক হোল। এত সব হয়েছিল কিন্তু জ্ঞান আমার একদিনের জন্যও লুপ্ত হয় নাই, আমি পাগল ও হই নাই। চেহেরাটা বেজায় বদলিয়ে গিয়েছিল মাথার চুল সব পেকে উঠেছিল, চক্ষু কোটর গত হয়েছিল, রং কাল হয়েছিল আর মুখখানটা হ'তে যেন ঈশ্বরের ছাপ তুলে নিয়ে বাঁদরের মুখের ছাপ কে বসিয়ে দিয়েছিল। এরূপ অসম্ভব পরিবর্ত্তন হয়েছিল নাকি রামরাম বাবুর ঘরে একরাত্রের অবরোধের ফলে। অবশ্য এ আমার শোনা কথা কেন না এতদিনের মধ্যে শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখবার অবসর ও হয় নাই আকাঙ্ক্ষাও না। আরও শুনেছিলুম যে আমার এই পরিবর্ত্তন দেখে অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণের, ফরাসী বিপ্লবের সময় বন্দিনী রাণীর আকৃতির পরিবর্ত্তন যে সম্ভব, সেটা স্বীকার করে নেবার নাকি খুব সহায় হয়েছিল। তাও ভাল!

ঘুরতে ঘুরতে টলতে টলতে মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে, পুনরায় নির্য্যাতিত হ'বার আশঙ্কা সত্ত্বেও একদিন সকাল বেলায় রামরাম বাবুর দরজায় এসে দাঁড়ালুম—বড় আশা কিশোরী,

আমারই ভগ্নি কিশোরীর সমাচার জানবো। ফটকের পাশে আসতেই দেখলুম একখানি প্রকাণ্ড মটর গাড়ীতে রামরাম বাবু একজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে আমারই সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। কেউ ফিরেও তাকালে না—ঐশ্বর্য্য আবার দীনতার পানে কখন চেয়েছে! পশুকে আর মানুষ কবে কোলে তুলে নিয়েছে! হয়তো কেউ নেয়; কিন্তু সে সখের বশবর্ত্তী হয়ে না হয় কার্য্য উদ্ধারের আশায়। সখ যেমনি মিট্‌লো, কাজ যেমনি ফুরুলো বাস্ বুদ্ধিমানের মত 'বিহায় জীর্ণানি'। বন্দুক ঘাড়ে যে দরোওয়ান মহাপ্রভু পাহারা দিচ্ছিল তার নিকটবর্ত্তী হয়ে কিশোরীর কথা জিজ্ঞাসা করলুম, হায়রে কপাল, সেও জাবুকের মত ঘাড় দুলিয়ে বললে "আরে যাও, পাগলা, কাহে ফজিরমে দিললাগি করতা।" ভিতরে যেতে চাইলুম বাধা দিলে। তার দোষ কি? সেও যে বুদ্ধিমানের সমাজে ঘোরা ফেরা করে। তারও সৎসঙ্গ লাভ হয়েছে—শিক্ষা দীক্ষা তো গোপনে প্রকাশ্যে তারও আরম্ভ হয়েছে। মানুষ সে আবার উদ্ভাবনী শক্তিও তো তার কিছু কিছু আছে। কাজেই সে এমন অন্যায় করবে কেমন করে?

পুরাণ কথা মনে হোল। মনে হোল একদিনের অবারিত দ্বার আজ গ্রহের ফেরে চির আবদ্ধ। একদিন যাকে দেখলে চাকর চাপরাশী ভয়ে কেঁপে উঠতো, হায়রে বিধিলিপি, আজ তাকে তা'রাই আবার হীনচক্ষে দেখছে। এত বৈচিত্র্য ময় জগৎ কন?

উত্তর নাই, হবেও না। কি করবো না করবো ভাবছি এমন সময়ে দেখলুম আমার পুরান আমলের খাস চাকর সেইদিকে আসছে। তাই আশায় উৎফুল্ল হয়ে তার আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। ভাগ্যক্রমে সে ফটকের বাইরে আসতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম "ভোলা, খবর সব ভাল ? দিদিমণি কোথায় ?" এই কথা বলতেই ভোলা আমার মুখের পানে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তারপর শেষে চিনতে পেরে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাপুস্ নয়নে কাঁদতে লাগলো। উপভোগ করবার দৃশ্য হ'লেও সদর রাস্তায় ফুটপাতের (footpath) উপর দাঁড়িয়ে থাকা উচিৎ নয় ভেবে ভোলার হাতধরে একটু এগিয়ে এলুম। ভোলাকে ফের্ কিশোরীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলুম। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে "দাদাবাবু আপনাকে যে রাত্রে—" তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল তথাপি সে অনেক কষ্টে বললে "আপনাকে সেই রাত্রে বাবু যখন নিজেই নীচে গিয়ে আটক্ করে রাখলেন সেই অবসরে দিদিমণি আমায় একখান পত্র দিয়ে আপনাকে দিতে বলে দিলেন আর বললেন যে 'ভোলা আমি মরতে চললুম। আমায় গঙ্গার রাস্তা দেখিয়ে দে।' আমি কিছুতেই দেব না কিন্তু তিনি যখন বললেন যে এখানে থাকলে তাঁর ধর্ম্মহানি হ'বে তখন আর আমি দ্বিরুক্তি না করে বাগানের রাস্তা দিয়ে দিদিমণিকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে এলুম। দাদা বাবুগো এমনি পাবান আমি—" তার বাক্য-

রোধ হয়ে গেল, সে মথায় হাত দিয়ে রাস্তার উপর বসে পরলো। শেষে আমি—আমার মনের বল কি এখনও কেউ বোঝনি—শেষে আমিই তার হাত ধরে উঠিয়ে তাকে শাস্তনা দিয়ে সব কথা বলতে বললুম। শুনলুম, অবিচলিত চিত্তে শুনলুম যে ভোলার সম্মুখেই জন্মদুঃখিনী কিশোরী গঙ্গার জলে ডুবে সকল জ্বালা যন্ত্রনার হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছে। আনন্দ হোল না কিন্তু আশ্বস্ত হলুম, বুঝলুম যে ধর্ম্ম আছে আর যে ধর্ম্ম রাখতে চায় তার ধর্ম্ম বুঝি মানুষ কেন পিশাচেও নষ্ট করতে পারে না।

ইত্যবসরে বামরাম বাবুর মোটর গাড়ী সুসজ্জিতা ব্যভিচারিনী পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে এল। সদর রাস্তায় আমরা ছিলুম; কিন্তু সৌভাগ্য যে অমাদের উপর তাঁর দৃষ্টিপাত হয় নাই। মটর গাড়ি সশব্দে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে আমাদেরই পাশ বেয়ে ফটকের মধ্যে গেল। তখন আমিও আমার পুরান চাকরের, হৃদয়বান বন্ধুর হাতধরে বিপর্য্যস্ত জীবন বিপর্য্যয়ের মধ্যে ফেলে দিতেই জন কল্লোলের মাঝে মিশিয়ে গেলুম। পাশের ঘর হতে কে গেয়ে উঠলো "জীবনটা তো দেখা গেল মিছে শুধু কোলাহল।"

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

সে দিন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেল তবুও আমার স্ত্রী বিরজা প্রতিদিনের মত গামছা ঢাকা থালায় আমার জন্য 'পান্তী' নিয়ে এল না দেখে আমার বড় রাগ হয়ে গেল। কোন্ সকাল বেলায় দুটি চিড়েমুড়ি খেয়ে মাঠে এসেছি, তারপর রৌদ্রে জলে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করছি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর তথাপি বিরজার দেখা নাই। আপনার মনে বকৃতে বকৃতে মাঠের কর্দ্দমাক্ত বুকখানা ছেড়ে পাশের উচুঁ ডাঙ্গাটায় দাঁড়িয়ে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গ্রাম্য পথের দিকে প্রখর ভাবে দৃষ্টিপাত করলুম; কিন্তু বিরজার ছায়া পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হোল না। বিশেষ দুঃখে ও রাগে অবসন্ন মন আরও অবশ হয়ে উঠ্‌লো। আপাততঃ কোন উপায় ঠাওর করতে না পেরে চিরপরিচিত হুকা কল্‌কে নিয়ে তামাক সাজতে বসলুম। বাপ দাদার আমলের চকমকি ঠুঁকে আগুন বের করতে গিয়ে অসাবধানতায় বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলটা অনেকখানি ক্ষত করে ফেললুম। তামাক খাওয়া আর হোল না, শুধু ক্রোধাগ্নিতে নূতন ইন্ধন সন্ধান করা হোল মাত্র। ভাবলুম একবার গ্রামের মধ্যে

গিয়ে ব্যাপার কি জেনে আসি; কিন্তু হাতের কাজ তখনও অনেক অবশিষ্ট, অৰ্দ্ধেক মাঠখানটায় তখনও ধানের গুছি পোঁতা বাকী, গুছিগুলিও অসংলগ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, আর বাড়ী গিয়ে ফিরতে অনেক বিলম্ব হ'বে, হয়তো বিরজাও এখুনি এসে পরবে এই সাত পাঁচ ভেবে ও সংকল্প আপাতত পরিত্যাগ করলুম। একবার ভাবলুম বিরজা তো কখনও দেরী করে না, আমার খাওয়া দাওয়া নিয়েই সারাটি দিন সে ব্যস্ত থাকে, আমাকে যতক্ষণ সে না খাওয়ায় ততক্ষণ কার্যান্তরে তার মন উঠে না, তবে কেন সে আজ এত বিলম্ব করছে। দুর্ভাবনায় মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। অমনি গ্রামের দুষ্ট চরিত্রদের কথা মনে এল, আরও মনে এল যে রক্ষক্‌বিহীন্‌ সুন্দরী বিরজার বিপদপাতের সম্ভাবনা এই অত্যাচারী লম্পট জমিদারের গ্রামে বড় বেশী কথা নয়, কিন্তু তখনই আবার ভাবলুম যে, দিনের আলো এতবড় একটা পাপকাজ করবার সহায়তা কেমন করে করতে পাবে! তাই আশা ও হতাশার দ্বন্দক্ষত বুক নিয়ে বিরজার আগমন পথ লক্ষ্য করতে আবার ডাঙ্গাটার উপর এসে দাঁড়ালুম—যতদূর দৃষ্টি চলে দেখলুম, খুব ভাল করেই দেখলুম কিন্তু বিরজার কোন চিহ্ন ও মিললো না। এতক্ষণে ও যখন বিরজা এল না তখন নিশ্চয়ই একটা না একটা গোলমাল বাধবার সম্ভাবনা —এই মনে হ'তেই ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণ কেঁপে উঠলো, ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলে গেলুম। হাতের কাজ অসম্পূর্ণই রইল, হুকা

কল্‌কা তামাকের ডিবা সব মাঠেই রয়ে গেল, শুধু কোমরের গামছা খানটাকে কাঁধে ফেলেই ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হলুম।

গ্রামে প্রবেশ করতেই দুই একজন জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত সাক্ষাৎ হোল—বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু কেউ কিছু বললে না। বললে না কিম্বা বলতে চাইলে না তাও তাদের ভাব গতিক দেখে বুঝে উঠতে পারলুম না। তাদের অন্য মনস্ক জবাবে মনে সত্য সত্যই ভয়ের সঞ্চার হোল, একদণ্ডে শুকনো মুখ চোখ আরও শুকিয়ে গেল কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। তাই বেশী কথা না কয়েই ত্বরিতপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলুম। গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হয়েই দেখি, ঘরের দরজা খোলা, তৈজস পত্র এলোমেলো ভাবে যেখানে সেখানে পতিত, জন মানবের সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত নাই। 'বিরজা, বিরজা' বলে উচ্চৈস্বরে ডাকলুম, হায় কেউ সাড়া দিলে না। একটা বিড়াল করুণ সুরে মেউ মেউ করে আমার পানে ভীতি কাতর চক্ষে চাইতে চাইতে শূন্য ঘর হ'তে বের হয়ে বাইরে চলে গেল। আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে দেখে মাথায় হাত দিয়ে আঙ্গিনার উপর বসে পরলুম। 'ভগবান, কি করলে, দুঃখের ভাত সুখে খেতে দিলে না' বলে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করেই সংজ্ঞালুপ্ত হয়েই মাটীতে পড়ে গেলুম।

যখন চৈতন্য হোল তখন দেখছি ছবির মা আমার পাশে

দাঁড়িয়ে আমায় বাতাস করছে। গ্রামে আমার আত্মীয় কুটুম্বের অভাব ছিল না, সম্পদে অনেক অনাত্মীয় ও আত্মীয়তায় মেতে উঠতো; কিন্তু আজ আমার এই দুর্দ্দিনে একজন ও আমার বাড়ীর কানাচে এল না। গ্রামবাসীর বিপদে, প্রতিবাসীর দুঃখে একজনও একটা সামান্য মুখের কথা বলেও খোঁজ নিলে না এই আশ্চর্য্য! যাই হোক ছবির মা, জাতিতে বাগ্দী, মাঝে মাঝে আমাদের ২।১ টা বরাত খেটে দিত, থারে দেওয়া কাপড় পুকুরে কেচে দিত। এই তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। আজ এই বাগ্দিনী আমার শুশ্রূষা করলে, কিন্তু জেঠা, খুড়া মামা যাঁরা এতদিন খুব মুরুব্বিপনা ফলাতেন, আত্মীয়তায় ফেটে পড়তেন তাঁরা একবারও উঁকি মারলেন না, ব্যাপার কি হয়েছে জানালেন না, বিহিত কিছু আছে কিনা বললেন না। চমৎকার আত্মীয়, বড় চমৎকার আত্মীয়তা!

আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'তেই ছবির মাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলুম। ভদ্র সমাজে অস্পৃশ্যা এই বাগ্দি রমণী, আহা, পরদুঃখে তার প্রাণ ফেটে গেল, বারিধারায় তার কোটর প্রবিষ্ট চোখ দুটী ভর্ত্তি হয়ে এল। অবশেষে অনেক কষ্টে আপনাকে সামলিয়ে সে বললে "শিবু মোড়ল, বৌমাকে সময় বুঝে জমিদার ধরে নিয়ে গেছে। ঐ বুড়ো বামুন ও সঙ্গে ছিল। কেউ বাধা দেয় নাই।" সংবাদটা শুনে আমার মাথা হ'তে পা পর্য্যন্ত একটা তাড়িৎ প্রবাহ

ছুটে গেল। ভাবলুম যদি এই জানোয়ার জমিদারের মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে এই সীতা হরণের উপযুক্ত প্রতিফল দিতে পারি তবে বুঝি গায়ের জ্বালা প্রশমিত হয়; কিন্তু সহায় সম্পদহীন, আত্মীয় বন্ধুহীন, শক্তিহীন সামান্য চাষার ছেলে আমি কেমন করেই বা অসম সাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হ'তে পারি। ভাবতেই মনটা বড় দমে গেল; তবু প্রতিহিংসার গোল গোল লাল চোখ দুটো আমার পানে পলকহীন্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার দীনতা হীনতা অসামর্থ সব ভুলিয়ে দিলে। অমনি 'জয় তারা' বলে দাঁড়িয়ে উঠেই, পা তখনও কাঁপছে, হৃদয় প্রতিমুহুর্ত্তে আতঙ্কে শিউরে উঠছে, চোখ কাণ দিয়ে আগুন ছুটছে, তথাপি কম্পিত চরণে ভর দিয়ে বুকের জ্বালা জুড়ুতে ঘরের কোন হ'তে বহুদিনের মরচাধরা একগাছা সড়কি বের করে জমীদারের মুণ্ডুপাত করতে বের হ'ব এমন সময়েই বৃদ্ধ, গ্রামের ঠাকুর দাদা তামাকু সেবন করতে করতে প্রাঙ্গনে আবির্ভূত হ'লেন। ঠাকুরদাকে দেখেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে গেল। বৃদ্ধ, শয়তানের চূড়ামণি, গ্রামের যাবতীয় অনর্থের মূল, দূতীর অগ্রগণ্য এই মনুষ্য বেশী পিশাচকে দেখে আমার সামান্য যে টুকু জ্ঞান ছিল তাও লুপ্ত হয়ে গেল। মনে হোল, কারণ অনেক, ছবির মা বলেছে, লোকে বলে আমিও জানি তাই মনে হোল যে এই বৃদ্ধ ভণ্ড কপটাচারী জমীদারের গুপ্তচর হয়ে আমার অনুপস্থিতির সুবিধা নিয়ে আমার

সর্ব্বনাশ করেছে, আবার বুঝি বাক্যের ললিত ছটায়, কিম্বা প্রলোভন দেখিয়ে চাষাকে মুগ্ধ করবার আশায় আমার প্রত্যাগমনের সংবাদে আমারই কাছে আত্মীয়তার ভাণ করতে এসেছে, তাই পুরুষ কণ্ঠেই বললুম "চোর, এইবার তোমার মনের সাধ মিটেছে তো? গৃহস্থকে গৃহহীন করে, সতীকে চরিত্রহীন পশুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঐ কালামুখ নিয়ে ফের আমার কাছে এসেছ? এই দণ্ডে আমার বাড়ী হ'তে দূর হয়ে যাও নইলে জমিদারকে খুন করবার আগেই তোমাকেও খুন করবো।" হাতের সড়কিটা সজোরেই মৃত্তিকার বক্ষে আঘাত করলুম—মাটি নীরবেই আঘাত সহ্য করলে, কিন্তু ঠাকুরদা ভয়ে দুপা পিছিয়ে গেল। অধার্ম্মিক শঠ সহজে বিচলিত হ'বার পাত্র নয় তাই—ধর্ম্মের দোহাই দেখিয়ে বললে "শিবু, আমি ব্রাহ্মণ, জানিস্ ব্রাহ্মণকে কুকথা প্রয়োগ। ব্যাটা অধঃপাতে যাবি।" "ব্রাহ্মণ! কে তুমি? একগাছা পইতে গলায় থাকলেই যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে আজকালকার অনেক শূদ্রেরা ও বামুন, চণ্ডালেরা ও বামুন। ভাল বলছি ঠাকুর এখন ও তুমি সরে যাও নইলে তোমায় আর জীয়ন্ত রাখবো না।" রাগে আমার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল; কিন্তু ছবির মায়ের আকুলি ব্যাকুলি তখনও আমায় ঠিক্ রেখেছিল। ঠাকুরদা সহজে ছাড়বার পাত্র নয় তার উপর তার সহায় জমীদার, কাজেই তার বুকের ছাতি একহাত চেয়েও বড়; তাই কর্কশ স্বরেই বললে

"ছোট লোক কিনা, তাই আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। "ছোট লোকের ঘরে জন্ম আমার, আমি ছোট লোক হ'ব এ আর আশ্চর্য্য কি ; কিন্তু ভদ্রঘরে উচ্চকুলে জন্মিয়ে তুমি ছোট লোকেরও অধম হয়েছ সে জ্ঞান আছে কি? পরস্ত্রী ধরে নিয়ে জমিদারের পাে ডালি দেওয়া, নিজের বোনঝিকে অর্থের লালসায় জমিদারের শয়নাগারে পাঠিয়ে দেওয়া, আত্মীয়া, অনাত্মীয়া সরলা রমণীদের প্রলোভনে মর্য্যাদা হানি করা ভদ্রলোকেরই কাজ!" হারামজাদা, পাজি, চুপ কর নইলে খড়মের ঘায়ে ব্যাটা কে—।" ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেল, সংস্কারের বাঁধন খসে গেল, ছবির মায়ের মধ্যস্থতা ব্যর্থ হোল, চাষার গোঁয়ার্ত্তামি প্রকটিত হয়ে উঠলো। প্রহৃত ঠাকুরদা' হয়তো বা ছবির মা বর্ত্তমান না থাকলে, সে না বাধা দিলে রক্তের স্রোত বয়ে যেত, গুরুতর ভাবে প্রহৃত ঠাকুরদা' কাঁপতে কাঁপতে "ব্রাহ্মণের গায়ে হাত, ব্যাটা নির্ব্বংশে যাবি" ইত্যাদি বলতে বলতে জমিদারের বাড়ী পানে চলে গেল। ছবির মা শেষে বললে "বাবা শিবু, ছেলে মানুষ, তুমি কি করলে। এখুনি জমিদারের লোক এসে তোমায়ও ধরে নিয়ে যাবে। বাবা, এ বুড়ির বুদ্ধি নাও। একবার থানায় খবর দাও, কপালে যা থাকে হ'বে। জমিদারের সঙ্গে কি আমাদের লড়াই চলে বাবা।" আমি রাগতঃই বললুম "ছবির মা, একি মগের মুলুক যে ধর হ'চ্ছে গৃহস্থের বৌকে ধরে নিয়ে যাবে।" "তাইতো বলছি বাবা, একটু

দেরী না করে তুমি একবার থানায় যাও।" কি জানি কি ভেবে আর কোন কথা না বলে বাড়ীর বার হ'য়ে নিকটবর্ত্তী মনসাগঞ্জ থানার রাস্তা ধরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করলুম।

থানায় পৌছিয়ে, দারোগা বাবুর খোঁজ করতেই ২।৩ জন কনেষ্টবল "আরে চোপ্ চোপ্ খাড়া রও" বলে আমার রাস্তা আগলিয়ে দাঁড়ালে। তাদের যে তখন জেলার পুলিশ্ সাহেব এসেছে তা আমি জানতুমও না, জানবার জ্ঞানও আমার ছিল না। একে চাষা, তার উপর আজ সকল জ্ঞান বিরহিত, তাই বাধা প্রাপ্ত হয়ে চীৎকার করে বলে উঠলুম "ওগো গরীব আমি, জমীদার আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমায় দারোগা বাবুকে দেখিয়ে দাও।" আমার চীৎকারে সাহেব কাজ ছেড়ে বাইরে এসে খাঁটি বাঙ্গলায় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার কি হয়েছ ?" প্রাণের আবেগে আমি সাহেবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলুম। সহস্র চেষ্টায় বাক্য স্ফুরণ হোল না। জমাদার, দারোগা কনেষ্টবল সকলেই আমাকে স্থির হ'তে বললে, কিন্তু দয়ার্দ্রচিত্ত সাহেব বললেন "না, না ওকে নিষেধ কোরো না। ওর নিশ্চয়ই একটা severe shock লেগেছে। একটু কাঁদতে দাও, ওর মনটা কিছু সুস্থির হোক্।" তাঁর দুই একটা ইংরাজি কথা আমার বোধগম্য হোল না যদিও মধ্য ইংরাজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছিলুম তথাপি মনে হোল যে ভগবান দয়া করে এ গরীবের

আজ সহায় হয়েছেন, তাই তিনি এই নির্ভীক্ দয়ালু সাহেবকে আমার সাহায্য স্বরূপ মিলিয়ে দিয়েছেন; নতুবা জমিদারের বিরুদ্ধে দারোগা বুঝি কিছুই করতো না, করে উঠতেও পারতো না।

কান্নার বেগ তখন অনেকটা রুদ্ধ হয়েছিল, মনের গলদ অনেকটা জল হয়ে বেরিয়েছিল, তাই সময় বুঝে সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "এইবার তোমার কি অভিযোগ বলতে পারবে, আশা করি।" সাহেবের কথায় আশ্বস্ত হয়ে জমিদারের পূর্ব্বাপর যা কিছু জানতুম, গ্রামে সে কি করে এবং আমার ও দুঃখের কাহিণী এক এক করে সমস্ত বললুম। আমার কথা শেষ হ'তেই সাহেব দুই একটি ইংরাজী কথায় দারোগা বাবুকে কি জিজ্ঞাসা করলেন; তারপর আমায় লক্ষ্য করে বললেন "তোমার কি মনে হয় যে তোমার স্ত্রী এখনও জমীদারের ঘরে আটক্ আছে?" "তা তো জানি না হুজুর, তবে জমিদার জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে তাই জানি, এর পূর্ব্বে দুইচার বার এরূপ চেষ্টাও করেছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।" সাহেব তখনই ইংরাজিতে দারোগাকে কি বললেন অমনি দেখতে দেখতে ৬।৭ জন কনেষ্টবল ও ৬।৭ জন চৌকিদার সজ্জিত হয়ে গরম গায়ে আসবার জন্য প্রস্তুত হোল। সামান্য চাষার প্রার্থনায় সাহেব, দারোগা, ফৌজ ও আমায় সঙ্গে করে জল কাদা ভেঙ্গে মেঠো রাস্তায় পায়ব্রজে চলতে আরম্ভ

করলেন। মূর্খ চাষার ছেলে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ভাবলে যে পরদুঃখে কাতর হয়ে পরের জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করতেও কোনদিন যাদের দ্বিধা বোধ হয় না তাদের সমাদর করতে তাদের মান রাখতে দুনিয়ার কে না নিজের বুক পেতে দেবে—তাই বুঝি ইংরাজ আজ দুনিয়ার রাজা।

ধরম গাঁয়ে যখন আমরা প্রবেশ করলুম তখনও সূর্য্য সম্পূর্ণ পাটে বসে নাই তবে আর বেশী বিলম্বও নাই। আষাঢ়ের দীর্ঘ দিন তাই দিনের আলোক তখনও বর্ত্তমান ছিল। চাসার সঙ্গে এতগুলি পুলিশের লোক ও সাহেব দেখে গ্রামে একটা মহা হুলস্থূল বেধে গেল। কৌতূহল বশবর্ত্তী অনেক বালক বৃদ্ধও যুবক আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল; কিন্তু কি যে ব্যাপার তা কেউ বুঝে উঠতে পারে নাই। জমিদারের বিরুদ্ধে যে এই আয়োজন তা কেউ ভাবতেও পারে নাই—আর কেমন করেই পারা সম্ভব? সাহেবের আদেশে জমিদারের বাটীর চতুর্দ্দিকে যখন পুলিসের লোকে ছেয়ে গেল, তখন জমিদারও অবাক, গ্রামবাসীরাও ততোধিক। জমিদার তখন পাত্রমিত্র নিয়ে কি একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল, তাই সাহেব ও পুলিশ দেখে চমকিয়ে উঠেই পার্শ্বস্থিত জনৈক অনুচরকে কিসের ইঙ্গিত করলে। পার্শ্বচর আদেশ পালনার্থ উঠে যাবার চেষ্টা করতেই সুচতুর কর্ম্মদক্ষ সাহেব তাকে বাধা দিয়ে জমীদারকে লক্ষ্য করে বললেন "দেখুন, শিবরাম বাবু, আপনার

বিরুদ্ধে আজ বিষম অভিযোগ উপস্থিত। আপনি কি এই ব্যক্তিকে চেনেন?" জমিদার বেশ গম্ভীর ভাবেই বললেন "ওকে আমি বিশেষরূপে চিনি, ও আমারই একজন চাষা প্রজা, নাম শিবু। সাহেব—"উত্তম, আপনি কি ওর ঘর দোর ভেঙ্গে ওরই স্ত্রীকে ধরে এনে আটক করে রেখেছেন?" জমিদার—"অসম্ভব।" সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ঠাকুরদা বললেন "ও ব্যাটা চাষা, মস্ত বদমায়েস। গ্রামের কোন লোকের সঙ্গে ওর সদ্ভাব নাই। কোথায় কি হয়েছে, অনর্থক ব্যাটা,—।" সাহেব বেশ মিষ্ট কথায় বললেন "দেখুন, আপনি কে আমি জানি না, হয়তো জমিদার বাবুর আত্মীয় কিম্বা বন্ধু কেউ হ'বেন; কিন্তু আপনাকে তো কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, আপনার কিছু বলবারও অধিকার নাই।" ঠাকুরদা বিশেষ অপ্রতীভ হয়ে চুপ করে গেলেন আর আমি উত্তেজিত হয়েই বললুম "ধর্ম্মাবতার, এই বুড়োই যত অনর্থের মূল। এর জন্য গ্রামে লোকের স্ত্রী কন্যা নিয়ে বাস করা দুরূহ। এই কুপরামর্শ দাতা, এই দলের নেতা।" জমিদার ও ঠাকুরদার আকার প্রকারে বোধ হোল তারা আমায় একলা পেলে তখনই চিবিয়ে খায়, কিন্তু হায়রে কপাল, আজ বাঘের সাম্নে শৃগালদের উত্তেজিত হয়ে লম্ফ ঝম্ফ করবার আদৌ সুবিধা হোল না; তাই কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেই শুধু ক্ষান্ত হ'তে হোল। সাহেব পুনরায় মিষ্টস্বরেই বললেন "দেখুন শিবরাম বাবু আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে, শুধু আইনের খাতিরে

আপনার বাড়ী খানাতল্লাসী করতে চাই।" জমিদার—"আমার অপরাধ।" সাহেব—"পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি আবার শুনতে চান শুনুন। আপনি জোর পূর্ব্বক অপরের স্ত্রীকে তার ঘর হ'তে ধরে এনে আবদ্ধ রেখে সরকারের আইনের অমর্য্যাদা করেছেন, শান্তিভঙ্গ করেছেন। আর তাই প্রতিপন্ন করবার জন্য আমি স্বয়ং সদলবলে অসময়ে আপনার উপরেও যে সরকারের আইন খাটতে পারে তাই দেখাতে এসেছি, আমায় মাপ করুন।" জমিদার—"আপনার সঙ্গে বাক্ বিতণ্ডা করবার আমার ইচ্ছা নাই, তবে আমি দেখতে চাই যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ নামা আপনার নিকট আছে কি না? দেখলুম সাহেব বেশ একটু অপ্রতিভ্ হ'লেন ঈষৎ বিচলিতও হ'লেন; কিন্তু তখনই ধীর ভাব অবলম্বন করে বললেন "দেখুন, সে সুযোগ আমি পাই নাই। তবে নিজের ইচ্ছায় যে আপনাকে উত্যক্ত করতে এসেচি তাও নয়। আপনার উপর আমার কোন জাত ক্রোধ থাকা অসম্ভব কেন না এতদিন, দুর্ভাগ্য আমার, আমি আপনাকে জানতুমও না; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে গরীবের সর্ব্বনাশ হ'বে মানসম্ভ্রম ক্ষুন্ন হ'বে ইংরাজরাজ তা সহ্য করবেন না আর সেইজন্যই তাঁর আইনের বলে শান্তিরক্ষক আমি এই ব্যাপারের তদন্তে এসেছি এবং তদন্তের জন্য যেটা সুবিধা বিবেচনা করবো সেটা আমাকে করতেই হ'বে আর তার জন্য যা কিছু টৈকিয়ৎ দিতে হয়, আমি দেব, শাস্তি ভোগ করতে হয় আমি

করবো; তজ্জন্ম আপনার কোন চিন্তা নাই। এখন আপনার অনুমতি পাই উত্তম, নতুবা আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করতেই হ'বে।" গম্ভীর ভাবেই জমিদার বললেন "মশায় আমি সি ক্লাশের (C. class) দাগী নয়, চোর নয় ডাকাত নয় যে যখন খুসী আমার ঘর অনুসন্ধান করবেন অতএব ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশনামা না দেখালে আমি এই অবৈধ থানা-তল্লাসী করতে দিতে পারি না জানবেন।" এত ভদ্র সাহেব এই দাম্ভিক পরাস্বপাহারী জমিদারের আইনজ্ঞানে সন্তুষ্ট না হয়ে বরং রুষ্টই হ'লেন এবং গুরুগম্ভীরস্বরে বললেন "দেখুন, হুকুম নামা আমি আপনাকে দেখাতে বাধ্য নয়। যদি আপনার কোন ক্ষমতা থাকে তবে আপনি আমার কর্ত্তব্যে বাধা দিন।" এই বলেই ইংরাজিতে সাহেব দারোগাকে কতকগুলি কি বললেন এবং প্রয়োজন হ'লে বল প্রকাশেও কুণ্ঠিত না হয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করতে আদেশ দিলেন। সাহেব তখন রুদ্রমূর্ত্তি, তাঁর দুই হাতে দুই পিস্তল। ব্যাপার দেখে শুনে জমীদারও অবাক্ অনুচর পার্শ্বচরেরাও ততোধিক—আমার তো কথাই নাই। দারোগার উভয় সঙ্কট; একদিকে উপরওয়ালার আদেশ, অন্যদিকে এই প্রবল প্রতাপ জমিদারের আক্রোশ।

যাই হোক অন্দর মহলের অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে গেল; কিন্তু বিরজার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষে

সাহেব অনুতাপের স্বরে আমায় বললেন "শিবু তুমি তো বাঙ্গালী, তোমাদের উপকার করতে আসাই আমার ভুল হয়েছিল। শেষে আমায়ও তুমি বিপদে ফেললে।" আমার বাক্যস্ফূরণ হোল না, দুঃখে ও লজ্জায় উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আমার মলিন মুখ আরও মলিন হয়ে উঠলো। আমার স্ত্রী অপহৃত, দোর্দ্দাস্ত জমিদার ক্ষিপ্ত আত্মীয়েরা কুপিত শুধু যাঁর করুণা বলে বিজয় দর্পে মেতে উঠেছিলুম, ভাগ্যদোষে, তিনিও উত্যক্ত! হায়, হায়, কেন এ দুরভিসন্ধি মনে এল, ধনবানের উপর দরিদ্রের আক্রোশ কেন আমায় উন্মত্ত করলে। ভগবান্ তোমার সনাতন প্রমানুসারে দরিদ্রের তো যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে, কিন্তু তার দায়ে তার আশ্রয় স্থলকে ও ব্যথা দিলে কেন? ঈশ্বর, এ তুমি কি করলে! অবশেষে আমি ভয়ে ভয়েই বললুম "হুজুর, গরীবের শেষ কথা যদি শোনেন তবে হয়তো বিফল মনোরথে আজ আমাদের ফিরতে হ'বে না।" কে জানে কি ভেবে, হয়তো বা যেতে বসেছি যখন তখন আর বাকী থাকে কেন ভেবে, সাহেব বললেন "আচ্ছা, কি বলতে চাও বল। আমি বললুম "ধর্ম্মবতার, আইন কানুন জানিনা তবে আপনি যদি ঐ বৃদ্ধটিকে (ঠাকুরদাকে দেখাইয়া) ধরতে পারেন তা হ'লে আমার ধ্রুব বিশ্বাস বিরজার সন্ধান পাবেন।" আমার কথা শেষ না হ'তেই সাহেবের হুকুমে ঠাকুরদা ধৃত হ'লেন। সে ও অনেক রকম আইনের নজির দেখালে কিন্তু সাহেব কোন

কথাই শুনলেন না। শেষে জমিদারের ঘর হ'তে জমিদার ও তার পক্ষের সকল লোককে বহিষ্কৃত করে ঠাকুরদাকে সাহেব জেরা করতে লাগলেন। তখন সন্ধ্যার আঁধার সকল ঘরেই প্রবেশ করে বেশ আসর জমিয়েছে, তাই দারোগা বাবুর আদেশে ২।১টি হ্যারিকেনের আলো চৌকিদারেরা যোগাড় করে নিয়ে এল। অর্থলোলুপ ঠাকুরদাকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে এমন কি নগদ কিছু টাকা দিয়ে এবং সত্যকথা বললে বেকসুর খালাস পাবে এই আশ্বাস বাণী প্রদানে সাহেব শেষে জানতে পারলেন যে এই কাল পরিপূর্ণ বাইরের ঘরে যে স্থানটা অবরোধ স্থান বলে কার ও সন্দেহ হ'বে না সেই স্থানেই বিরজাকে মুখ হাত পা বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। এখন ও কেউ তার কাছে যায়নি এমন কি তাকে খেতে পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। যেমন অবস্থায় ধরে আনা হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থায় বিরজা এখন ও আছে।' কি আশ্চর্য্য! শুধু ঐ ঘরটা, অসংস্কৃত পরিষ্কৃত, ব্যবহারোনুপযুক্ত বাইরের ঘর বলে অনুসন্ধান করা হয় নাই। তখনই কাল বিলম্ব না করে আলোকের সাহায্যে সাহেব ঠাকুরদাকে সঙ্গে করেই সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। একটি ঘর অতিক্রান্ত হ'তেই কিসের অস্ফুট গোঙ্গানি শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হোল—অল্পকালের মধ্যেই হস্তপদ চোখ মুখ আবদ্ধ বিরজাকে দেখ্‌তে পেলুম। সাহেব আনন্দে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন, আমিও জোর হাতে

ভগবানকে ডাকতে লাগলুম। আশঙ্কা ও উদ্বেগ সব নিমিষের মধ্যে অন্তর্হিত হোল। সাহেবের আদেশে আমিই বিরজার সমস্ত বাঁধণ খুলে দিলুম; কিন্তু পরক্ষনেই দেখলুম বিরজা জ্ঞানশূন্য। পাথার বাতাসে ও জলের ছিটায় বিরজার চক্ষুরুন্মীলন হোল সত্য; কিন্তু পূর্ণ বিকারের লক্ষ্য দেখা গেল। হর্ষ বিষাদে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো। জোড় হাতে দয়াময়কে ডাকতে লাগলুম। ইতিমধ্যে সাহেব বাইরে এসেই জমিদার পুঙ্গবকে আহ্বান করতে আদেশ দিলেন; কিন্তু জমিদার বড় বুদ্ধিমান তাই তখন পলাতক; কিন্তু বুঝলে না যে পুলিশের তীব্র চক্ষু অপরাধীকে মাটীর নীচে হ'তেও টেনে বের করবে।

অগত্যা হাতকড়া আবদ্ধ ঠাকুরদাই আপাততঃ আমাদের সঙ্গে থানায় এল। সাহেবের আদেশে ডুলিযোগে বিরজাকেও থানায় নিয়ে আসা হোল। আমায় যা কিছু জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, সকলগুলিই জিজ্ঞাসা করে বিরাজকে নিয়ে আপাততঃ আমায় গৃহে প্রত্যাগমন করতে সাহেব আদেশ করলেন; কিন্তু আমার সজল নয়নের সকাতর প্রার্থনা সাহেবের কোমল প্রাণকে স্পর্শ করলে, তাই তিনি বিরজার চিকিৎসা ও আমার প্রাণ রক্ষার জন্য মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি কাল তক্ সদরেই আমাদের থাকবার সুব্যবস্থা করলেন। বিরাজকে ফিরে পেরে, সাহেবের করুণা লাভ করে আমি করুণা-ময়কে আবার ভক্তিভরে প্রণাম করলুম।

এক বৎসর ধরে মকর্দ্দমা চলবার পর জমিদার, ঠাকুরদা ও জমিদারের অন্যান্য দুইজন সহচরেরা সরকারের সুক্ষ্ম বিচারে জেলে গেল। শুনেছিলুম জমিদার নাকি হাইকোর্টে ও আপীল করেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার আপীল নামঞ্জুর হয়ে জমীদারকে এই আদালতের রায়ই মেনে নিতে হয়েছিল। বিরজা তখন সম্পূর্ণ সুস্থ আমি ও অত্যন্ত সসব্যস্ত। কেমন করে নিজের উদর পূর্ণ করবো, কেমন করে পরিবার প্রতিপালন করবো এই দুর্ভাবনায় সদাই ব্যাকুল, অথচ একটা কিছু করতেই হ'বে আর সেটা এখুনি। ভাবলুম গ্রামে ফিরে যাই, কিন্তু হায়রে বন্ধুহীন্ দীনহীন্ শিবু চাষার গ্রামে প্রবেশ বন্ধ, সমাজে মেশা বন্ধ, জ্ঞাত গোষ্ঠার মধ্যে খাওয়া দাওয়া বন্ধ, অথচ ধনবান জমিদার কিম্বা তার পরম বন্ধু ঠাকুর দা যারা সকল অপরাধে অপরাধী জেলের কয়েদী, দুষ্কৃতাচারী তাদের সমাজ, তাদের আত্মীয় বন্ধু তাদের আভিজাত্য যা কিছু সব ঠিক্ রইল এই বড় আশ্চর্য্য! হায়রে তবে দীনের গতি কি হ'বে, নিরাশ্রয়কে কে আশ্রয় দেবে? কিছুদিন দয়ার বারিধি, গুণের নিধি পুলিশ সাহেব আমাদের সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু এমনি দুরদৃষ্ট আমাদের যে এই মকর্দ্দমা অন্তে সাহেব ছুটি নিয়ে বিলাত চলে গেলেন। বাস্ আমাদেরও সব শেষ। এমন কি আজ আর দাঁড়াবার সংস্থান আমাদের নাই। পরের চাকুরী কিম্বা, দাসবৃত্তি অবলম্বন করে দিনপাতে

প্রবৃত্ত হয়েছিলুম কিন্তু অসৎ প্রকৃতিদের কৃপায় সে সুবিধা ও অধিক কাল স্থায়ী হোল না। কাজেই সহরের পরিচিত আশ্রয় কুটীর ত্যাগ করে, চোখের জলে বুক ভিজিয়ে বিরজার হাত ধরে রাস্তায় নেমে এলুম।

সহর হ'তে প্রায় তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করে অবশেষে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় একটা প্রকাণ্ড বটগাছ তলায় বসে—বেলা দ্বিপ্রহর তখন, রোদে চারিদিক ঝলসিয়ে উঠেছে পথে ও কোন পথিকের চলাচল নাই—শুধু বিরজা ও আমি পথিপার্শ্বের গাছ তলায় বসে আমাদের স্বামী স্ত্রীর অদৃষ্টটা খুঁটি নাটি করে পরীক্ষা করছি, এমন সময় দূরে দেখলুম একখানা হাওয়া গাড়ী স্ত্রী, পুরুষ বালক ও বালিকা পরিপূর্ণ হয়ে বিদ্যুতবেগে সহরের দিক হ'তেই ছুটে আসছে। চিন্তার খেই হারা হয়ে চাষার ছেলে গাড়ীর উদ্দাম গতিভঙ্গ একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে লাগলো। ঐ যাঃ, কি সর্ব্বনাশ। গাড়ী কোথায়? আরোহীদের কোলাহলে বালক বালিকার রোদন রোলে বিরজা ও আমি উৰ্দ্ধশ্বাসে উল্টান গাড়ীর নিকটে এলুম। গাড়ীর চালক, দুর্ভাগ্য তার, তাই আঘাতে গত প্রাণ। একটি স্ত্রীলোক গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত, বাকী সকলেই শুধু স্থান ভ্রষ্ট, জ্ঞান ভ্রষ্ট, ভূমি শায্যায় লুণ্ঠিত। নিজেদের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে দারুণ উৎসাহে প্রাণপণ আগ্রহে সকলের যথোচিত শুশ্রূষা করতে লাগলুম। আরোহীদের মধ্যে একজন

যুবক, একটি যুবতী, একটি বর্ষিয়সী রমণী একটি বালক ও একটি বালিকা। বর্ষীয়সী রমণী গুরুতর ভাবে আহত ও মাথা হ'তে প্রবল রক্তস্রাব হওয়াই সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হয়ে ও পড়ছিলেন। অন্যান্যের আঘাত সামান্য হ'লেও ভয় তাদের খুব হয়েছিল; কাজেই স্ত্রীলোকদের ভার বিরাজাকে দিয়ে হতচেতন যুবক ও বালকবালিকার ভার আমায় নিতে হয়েছিল। আমাদের সাধ্যাতীত শুশ্রূষায় যখন সকলেই কিছু সুস্থ হয়েছিল তখন এত ভদ্র তারা, এমন সময়েও আমাদের অসময়ের উপকার স্বীকার ক'রে কৃতজ্ঞতায় অবশ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট আমাদের, যে চারিজনের সরল নির্ম্মল আশীর্ব্বাদ চারিজনের ঐকান্তিক মঙ্গল কামনা আমাদের সাময়িক ভবিতব্য বুঝি খণ্ডন করতে পারলে না।

যাই হোক্ নিজেদের কথা বিস্মৃত হয়ে বিরজাকে বর্ষিয়সী রমণীর শুশ্রূষার ভার দিয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামে এলুম কিছু খাদ্য ও একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা করতে। মানুষের কপাল সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে তাই গ্রামে গিয়ে জানলুম যে সেখানকার অধিবাসী সকলেই মুসলমান। আহার্য্য সংগ্রহ তো হলো না, তথাপি গাড়ীর ব্যবস্থা হ'তে পারে এই ভেবে দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম কিন্তু তাদের কি একটা পর্ব্ব ছিল, তাই কেউ গাড়ী আনতে সম্মত হোল না। পার্শ্বের গ্রামে যাব; কিন্তু সেখানেও এই ব্যাপার জেনে

সটান সহরে আসবার মতলব করলুম। গ্রাম ছেড়ে যখন রাস্তায় উঠে সহরাভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়েছি, এমন সময়ে আর দুই খানি হাওয়া গাড়ী আমারই পাশ বেয়ে দ্রুত চলে গেল। ভাবলুম এদের সাহায্য প্রার্থনা করি; কিন্তু তখন তারা দৃষ্টির বাইরে কাজেই, 'সুবুদ্ধি চাষার' ছেলে আমি দ্রুতপদক্ষেপে সহরের পানেই অগ্রসর হলুম। মাত্র মুড়ি মুড়কী ক্রয় করে, একখানা গরুর গাড়ী সঙ্গে নিয়ে যখন ঘটনাস্থলে ফিরলুম, তখন বেশ জমাট বাঁধা অন্ধকার তার কাল কাল দুটি পাখা বিস্তার করে, তার পক্ষপুটের একটানা শব্দে চোকে ও কানে বেশ বাঁধা ধরিয়ে দিলে। কেন না সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি বিরজা নাই, আরোহীদের কেউ নাই, বালকের মৃতদেহ নাই, ভূপতিত মটর নাই, আছে শুধু এই সবের সাক্ষ্য এই হৃদয়হীন রাস্তা, আর তার বুকে এলো মেলো দুই চারটা আঁচর, আর অদূরের ঐ—বিশালায়তন বট বৃক্ষ। আমার ভ্রম হয়েছে ভেবে গাড়োয়ানের নিকট হ'তে তার মলিন ও জরাজীর্ণ আলোকটি একবার চেয়ে নিলুম, ভাল করে স্থানটি লক্ষ্য করলুম; কিন্তু এযে ভ্রম হয়েছে তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না। পথিপার্শ্বের ঐ শত সহস্র পল্লব উপপল্লব প্রসারিত গগনভেদী বট বৃক্ষ, অসংস্কৃত, উচ্চনীচ, অপ্রশস্ত এই রাজপথ আর ও অনেক পূর্ব্বের পরিচিত দুই একটি শিরীস ও নিম্ব বৃক্ষ ইত্যাদি আমার স্মরণপথে নয়নপথে উদিত হয়ে বেশ ভাল করেই বলে দিলে এ চিনবার

ভুলনয় শুধু 'কালগত পাপক্ষয়'। ছায়া চিত্রের নৃত্যের মত এক একটি দৃশ্য আমার চোখের কোনে এক এক করে ভাসতে লাগলো,—পথপর্য্যটনে ক্লান্ত বিরজা ও আমি আমাদের ঐ বৃক্ষমূলে উপবেশন, আমাদেরই স্থূলবুদ্ধির বীক্ষনযন্ত্রে আমাদেরই ভবিষ্যৎ পর্য্যবেক্ষন, দূরে রাস্তার বুকে আরোহী পরিপূর্ণ হাওয়া গাড়ীর অবতরণ, বিপর্য্যস্ত বেগে ঐ গাড়ীর রাস্তার নীচে পতন, আরোহী-গণের সকরুণ ক্রন্দন, আমাদের সাধ্যমত তাদেব শুশ্রূষা করণ তারপর মূর্খ আমি কোন তথ্যের সন্ধান না নিয়েই যান ও আহার্য্যের অন্বেষণে গমন—একটার পর একটা সকলগুলিই আমার মনশ্চক্ষুর উপর উদ্ভাসিত হয়ে আমায় একটা বিষম ইন্দ্র-জালের মধ্যে ফেলে দিলে। কঠোর সত্য, ধ্রুব সত্য, নিশ্চিত সত্য কেমন করে গোলক ধাঁধায় পরিণত হ'তে পারে চিন্তা করছি, এমন সময় গাড়োয়ান আমায় লক্ষ্য করে বললে "ওহে বাপু, এই তো তোমার সেই বটগাছ। কৈ লোকজন কোথায়? রাত কতখানি হোল তার খবর রেখেছ কি?" আমি নিরুত্তর; আর কি উত্তরই বা দিতে পারি। জনমানবহীন এই প্রান্তরে আমারই মত একজন মূর্খ চাষাকে কি উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারি ভাবছি, এমন সময় পুনরায় সে বিরক্ত হয়ে বললে "কি রকম লোক হে তুমি? লোক নাই জন নাই, পাগলামী করে যে আমায় ঘর হ'তে বার করে আনলে যাও, আমার ভাড়া দাও।" ক্ষীণ

আলোকের সাহায্যে দেখলুম লোকটার চোখ মুখ দুইই উত্তেজিত। কপর্দ্দক বিহীন্ আমি কি করে কি করবো, কেমন করেই বা গাড়োয়ানকে সন্তুষ্ট করবো! কাছে মাত্র দুই আনা পয়সা ছিল তাও পরের উপকার করতে বুদ্ধিমান আমি খরচ করে মুড়ি মুড়কি সংগ্রহ করেছি। হায়, হায় আমি কি করেছি, বুদ্ধির দোষে হারাণ মাণিক বিসর্জ্জন দিয়েছি, আমি ও নিজে যেতে বসেছি। কাঁদবার ইচ্ছা হয় নাই, তথাপি তাপিতের চোখ দুটো বেয়ে শ্রাবণের ধারার মত অবিশ্রান্ত বারিপাত হোল, মুক্ত বক্ষ সিক্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু গাড়োয়ান এ সবের কিছুই বুঝলে না, শুধু আমার ধূর্ত্তামির অপবাদ দিয়ে অযথা গালাগালি করতে লাগলো। সবই এই বরাত! তার অপরাধ কি?

'কাঙ্গালের ঠাকুর, নিরপরাধীকে এত যন্ত্রণা দাও কেন' বলে আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকলুম, হায় সব ব্যর্থ হোল। এই প্রান্তর বুঝি আমার ভাগ্যপরীক্ষার স্থল ভেবে আতঙ্কে শিউরে উঠলুম। আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে রাস্তার উপর বসে পরলুম। অদূরে কিসের শব্দ একবার আমার কানে এল; কিন্তু তখনই শৃগালের বিকট চীৎকারের মাঝে ঐ কিসের শব্দটাও ডুবে গেল। গাড়োয়ান ক্রমাগত আমায় ডাকাডাকি করেও যখন কোন সাড়া পেলেনা অথচ গাড়ীর পাশেই আমি তখন সে তারই শিক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী আমার ও আমার সাত পুরুষের উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হোল। আবার, ঐ আবার কিসের শব্দ না?

ঐ, ঐ যে দূরে একটা তীব্র আলোক না, না, এযে নিকটে। একি, আলোটা রাস্তার এধার ওধার ছুটোছুটী করছে না! অমার্জ্জিত, অশিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন মন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়লো। ভীতি ব্যঞ্জক স্বরেই গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলুম "ভাই বলতে পার, ঐ আলোর মত কি একটা এই দিকেই ছুটে আসছে? আমায় মৃতজ্ঞানে আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা সে তো এতক্ষণ ধরেই করছিল, এইবার জীবিত দেখে বিষম চটেই বললে "তোর মাথা আর মুণ্ড। হদ্দ চাষা, পাড়াগেঁয়ে কি না। ওটা মটর গাড়ী আসছে বুঝতে পারছিস্ না?" তারপর নিজের মনে চাষার গুনগান করতে করতেই বললে "কি আপদেই পড়লুম এই ব্যাটা পাজির কথা শুনে। একে এখানকার রাস্তা অতি সংকীর্ণ তার উপর এবরো খেবরো। এখন গরু ভয় পেয়ে গাড়ীশুদ্ধ রাস্তা হ'তে ফেলে না দিলে বাঁচি।" এই বলেই সে একলাফে রাস্তায় অবতীর্ণ হয়ে গরুর কাঁধ হতে যোয়ান খুলতে ব্যস্ত হোল। ইতিমধ্যে গাড়ীর বেগ কমে এল, আলোটার ও তীব্রতা হ্রাস প্রাপ্ত হোল। আমি প্রেতের মত দাঁড়িয়ে শুধু চাষার আক্কেলের কথা ভাবছিলুম এমন সময় গাড়ীর ভিতর হ'তে কে 'শিবু শিবু' বলে ডাকতে আরম্ভ করলে। অপরিচিত কণ্ঠস্বর অথচ আমারই নাম ধরে ডাকছে। আমি নিরুত্তর অথচ অনেকটা অগ্রসর। ইতিমধ্যে গাড়ী হ'তে একজন প্রৌঢ় বলিষ্ঠ ও সুশ্রী পুরুষ আমার কাছে বরাবর এসেই

বললে "শিবু, তোমার বড় কষ্ট হয়েছে না? চিনিনা, কখনও দেখি নাই অথচ আমাকেই লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বলছেন তাও বুঝলুম তথাপি পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর। ভদ্রলোক সটান্ আমার হাত চেপে ধরেই বললেন "শিবু, বড় কষ্ট হয়েছে কিছু মনে করো না। এস আমার সঙ্গে এস। আজ তোমাদের কৃপায় আমার স্ত্রী পুত্র পুত্রবধু আসন্ন মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছেন। এস হৃদয়বান বন্ধু, তোমার আশা পথ চেয়ে তোমার সতী সাধ্বী পত্নী আমার আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই উৎসুক হয়ে আছেন। এস বিলম্ব করোনা। বিরজা লক্ষ্মী মা আমার কিছুতেই তোমাকে পিছনে রেখে যেতে চাইবেন না, কিন্তু আমার পুত্রবধূর অনুরোধে, আমার মুমূর্ষ স্ত্রীর ইঙ্গিতে তাঁকে অগ্রগামিনী হতে হয়েছে, তাঁর কোন দোষ নাই। এস শিবু তুমি মূর্খ চাষা হ'লেও হৃদয়বান, উপকারী, আমার প্রাণদাতা। তুমি আমার পুত্র স্থানীয়।" বুভুক্ষিত তরঙ্গায়িত সমস্ত প্রাণের যাবতীয় উদ্বেগ নিমিষে কেটে গেল—উল্লাসে মেতে উঠে এই সহৃদয় মহাত্মার পায়ে লুটিয়ে পড়লুম। উচ্ছ্বসিত প্রাণের বেগ বুঝি আমার মুখ দিয়ে বের করে দিলে নতুবা এতকথা বলবার শিক্ষা আমার ছিল না—"কে আমি আপনাকে জানি না; কিন্তু আপনি একজন মহাপুরুষ তার আর কোন সন্দেহ নাই; নতুবা যে চাষাকে সকলেই মূর্খ বলে' ঘৃণা করে, নীচ বলে' পিপীলিকার মত পায়ে দলে চলে যায়, উপকার

করলে ও প্রত্যুপকার না দিক্, স্বীকার করতে ও চায় না, জ্ঞানী হ'লেও সংস্কৃত শ্লোকের দোহাই দিয়ে অজ্ঞানতা প্রমান করে, অত্যাচার যার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আনন্দিত হয়, তার তৈয়ারী আহার্য্য বস্তু তারই কাছ হ'তে কেড়ে নিয়ে ভোগসুখে মেতে উঠে, মুখের গ্রাস তুলবার আগেই ব্যাকুলিত হাত দুটো কেটে দিতে চায়, সেই অবোধ দরিদ্র চাষাকে আজ আপনি পুত্র বলে আলিঙ্গন দিতে পারেন? আপনি সত্যই মহাপুরুষ, আমি আপনার পায়ের ধূলিকণা। আমায় ঝেড়ে ফেলে না দিয়ে চরণতলে রাখবেন, সেই আমার পরম সৌভাগ্য!" বিদ্যাবুদ্ধিহীন চাষার ছেলের মুখ দিয়ে কথাগুলো যে কি করে বের হোল তা তখন আমিও বুঝতে পারলুম না, আর যাঁকে লক্ষ্য করে বললুম তিনিও না। অদূরোপবিষ্ট পাড়োয়ান বুঝি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে আমার নাট্যকলার চরম বিকাশ দেখছিল। লক্ষ্মীমন্ত সাধুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে কখন যে মটর গাড়ীতে উঠে বসেছি তা জানতে ও পারি নাই, তবে গাড়োয়ান যখন ভাড়া চেয়ে বসলো, তখন আমি মুদ্রিত চক্ষু নিমিলীত করে সহযাত্রীর পানে তাকাতেই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে এক খানি দশ টাকার নোট পকেট হ'তে বের ক'রে গাড়োয়ানের হাতে দিয়ে বললেন "বাপু হে, কিছু মনে করো না, তোমার ও বিশেষ কষ্ট হয়েছে।" একসঙ্গে সে কখন ও তার জীবনে দশটাকা দেখে নি, তাই এই অপ্রত্যাশীত পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে আনন্দে

আটখানা হয়ে উঠলো। ভূমিষ্ট হয়ে মস্ত একটা প্রণাম করতে করতেই বললে "দেখুন দেখি হুজুর, আপনাদের জন্য আবার কষ্ট।" গাড়ী বিকট শব্দ করতে করতে ক্ষনেকের মধ্যেই সজীবতা প্রাপ্ত হোল। মোড় ফিরে গন্তব্যপানে ছুটবে, এমন সময় এক লম্বা লাঠি কাঁধে বৃহৎ পাগড়ী মাথায় একজন পশ্চিম দেশীয় জোয়ান "সেলাম হুজুর" বলেই আমাদের সম্মুখীন হোল। যদিও আমি ভয় পেলুম না, তথাপি বাধা পেয়ে বিশেষ সুখী ও হলুম না। মটরের মালিক, পার্শ্বের ভদ্রলোক এই পশ্চিম দেশীয় জোয়ানের অন্নদাতা মিষ্ট স্বরেই বললেন "পাঁড়ে জি, একেয়া বাৎ, তোমকো হাম ভেজা এই বাবুকা তলাস করনে; আর তোম বাস্ একদম ডুব মারা।" "নেহি হুজুর, হামারা কসুর হুয়া, সাচ বোলতাথা হাম দেরী দেখকারকে গাছ তলাপর শো রহা, বাস্ হুজুর, হামারা নিদ আ গিয়া থা। হামারা বহুত কসুর হুয়া। হামকো মাপ্ কি জিয়ে রাজা।" "আচ্ছা, আচ্ছা উসমে কুচ হরজা নেহি হায় মগর এইসা কাম্ কবি নেহি কয়। আও মটর পর বৈঠ্ যাও।" দারোয়ান মহাপ্রভু আশ্বস্ত হয়ে চালকের পার্শ্বে বসলেন, গাড়ীও চলতে লাগলো। আমি ভাবলুম "ভগবান তোমার কৃপায় আজ সদাশয়ের আশ্রমে। হায় নগন্য, সামান্য আমি আমার জন্য পেয়াদার বন্দোবস্ত; শেষে সন্তুষ্ট না হয়ে লক্ষীর বরপুত্র নিজেই ব্যস্ত। এতদিনে দেখলুম যে উপযুক্ত

পাত্রেই লক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছেন—যাতে লক্ষ্মীও সন্তুষ্ট শ্রীমন্ত ও প্রশংসিত।

বলা বাহুল্য ঐশ্বর্য্যবান, হৃদয়বান—ঐশ্বর্য্য ও হৃদয়ের একতা বুঝি জগতে বিরল—দেবতার কৃপায় বিরজা ও আমি এখন আশাতীত স্বপ্নাতীত সুখে ও স্বচ্ছন্দে আছি। শুধু বসে বসে খাওয়াটা ভাল দেখায় না, অথবা অন্নদাতাও কিছু করতে দেবেন না, তাই বিরজার বুদ্ধিগুনে জাত ব্যবসটা ভুলে যাওয়া ভাল দেখায় না, এই অজুহাতে রঙ্গনালার স্বনামধন্য সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পিতৃতুল্য পূজনীয় রায় বাহাদুর চুনীলাল আইচ এর চাষ বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে শুধু চাষাদির কার্য্য পরিদর্শন করতে লাগলুম। এই মিলনানন্দের কিছুদিন পরেই একদিবস সন্ধ্যাবেলায় আনন্দাশ্রুপাতে সিক্ত চোখ দুটি আমার চোখের উপর দিয়ে বিরজা বললে "এস, স্বামী যে সাধুর সুখাশ্রয়ে নিরাশ্রয়েরা আজ আশ্রিত, এস স্বামী সেই সাধুর মঙ্গল কামনায় আমরা দুটি প্রাণী প্রতিনিয়ত সাঁঝে ও সকালে তাঁর স্বাস্থ্য সুখ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য ভগবানকে ডাকবার ব্রত গ্রহণ করি, এস। জীবনে মরণে এই মন্ত্র জপই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হোক্ আর এই প্রার্থনা করবার শক্তি ও সামর্থ যেন আমাদের চিরদিন অটুট থাকে।" বিরজার এই সাধু সংকল্পে সত্যই আমার সর্ব্বশরীরে আনন্দ লহর প্রবাহিত হোল, তাই হর্ষ উথলিত চিত্তে বিরজার চিবুকে হাত দিয়ে বললুম "বিরু,-চাষা

হলেও আদর করেওই নামেই ডাকতুম—আমার প্রার্থনার মূল্য নাই। তুমি সতী, কায়মনোবাক্যে তুমিই তাঁকে ডাক। তোমার আকুল আহ্বানে কর্ণপাত না করে তিনি কিছুতেই থাকতে পারবেন না, নতুবা ধর্ম্ম কর্ম্মহীন সামান্য চাষা আমার ভাগ্যে এই সৌভাগ্যোদয় সম্ভব?" বিরজার লজ্জারক্তিম মুখখানা আমার মুখের উপর আপনিই ঢলে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে তার অস্ফুট অস্পষ্ট বাণী আমার কানে গেল "বেশ গো বেশ তাই হ'বে।"

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১। খেয়াল—গল্পের পুস্তক। মূল্য ৸০ আনা।

২। মোগল বাদসা—(পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক)
মূল্য ১৲ টাকা।

৩। উত্থান পতন—(যন্ত্রস্থ)